অবতার ও মহৎ জনের জীবনচরিত

ইউনিট ১০

ভূমিকা

ঈশ্বর এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সৃষ্টি, পালন ও সংহারকর্তা। এই পৃথিবীতে যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান হয় তখন ভগবান অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পৃথিবী থেকে সমস্ত পাপ, হিংসা, অধর্ম দূরীভূত করে পৃথিবীতে ধর্ম ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। যুগে যুগে ভগবান বিভিন্ন অবতারের রূপধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া এই পৃথিবীতে আরও অনেক সাধু পুরুষ জন্মেছেন, যাঁরা নিজেদের সাধনা ও মহৎকর্মের মাধ্যমে এই পৃথিবীর অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের জ্ঞানের আলো দেখিয়েছেন। ঈশ্বর সাধনার পথ দেখিয়েছেন ও সমাজকে কলুষমুক্ত করেছেন। এই ইউনিটে অবতারতত্ত্ব ও মহৎ জনের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১ : অবতার
পাঠ-১০.২ : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
পাঠ-১০.৩ : কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব
পাঠ-১০.৪ : শ্রীচৈতন্য
পাঠ-১০.৫ : তুকারাম
পাঠ-১০.৬ : রামপ্রসাদ
পাঠ-১০.৭ : রাণী রাসমণি
পাঠ-১০.৮ : শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর
পাঠ-১০.৯ : শ্রীরামকৃষ্ণ
পাঠ-১০.১০: স্বামী বিবেকানন্দ
পাঠ-১০.১১: শ্রীমা
পাঠ-১০.১২: মীরাবাঈ
পাঠ-১০.১৩: প্রভু জগদ্বন্ধু
পাঠ-১০.১৪: শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

পাঠ-১০.১ অবতার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অবতারের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ঈশ্বরের অবতাররূপে আবির্ভূত হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	অবতার, ঈশ্বর, স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান, নিরাকার, অপ্রপঞ্চ, শিষ্ট, পরিত্রাণ, ঈক্ষণ, পুরুষাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, যুগাবতার, শক্তাবেশাবতার, সনক, স্থূল, লীলাবতার, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি ইত্যাদি।

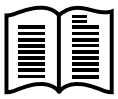

অবতার ও অবতারের প্রকারভেদ :

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছুর স্রষ্টা। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও নিরাকার। তবে নিরাকার হলেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যে কোনো আকার ধারণ করতে পারেন। বিশ্বকার্যের জন্য ঈশ্বর যখন অপ্রপঞ্চ হতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ বা অবির্ভূত হন তখন তাঁকে অবতার বলে। অবতার এর অর্থ হচ্ছে উপর থেকে নিচে নামা বা অবতরণ করা। অর্থাৎ কোনো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর স্বেচ্ছায় জীব বা সাকাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলে তখন তাঁকে অবতার বলে।

ঈশ্বর এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য ধর্ম অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছেন। তবে পৃথিবীতে কখনও কখনও খুব খারাপ অবস্থা বিরাজ করে। অশুভ শক্তির কাছে শুভ শক্তি পরাস্ড় হয়। সমাজে বিরাজ করে চরম বিশৃঙ্খলা। তখন ঈশ্বর স্বয়ং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য। তিনি পৃথিবী থেকে সমস্ত অশান্তি দূরীভূত করেন। প্রতিষ্ঠা করেন শান্তি। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন–

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।(৪/৭)
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।(৪/৮)

অর্থাৎ, পৃথিবীতে যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্ম বেড়ে যায়, তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ ও ধর্ম স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

ঈশ্বর যখন স্বয়ং বা তাঁর অংশ দ্বারা কর্তারূপে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণাদি করেন তখন তাঁর অবতারকে পুরুষাবতার বলে। ঈশ্বরের তিন প্রকার ইচ্ছাশক্তির অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ, জ্ঞানশক্তির অধিষ্ঠাতা বাসুদেব এবং ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা বলরাম। প্রকৃতির গুণসম্বন্ধীয় অবতারকে গুণাবতার বলে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হচ্ছেন গুণাবতার। প্রতি মন্বন্তরের অবতারকে মন্বন্তরাবতার বলে এবং গ্রন্থের ভাষায় এর সংখ্যা পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার। ব্রহ্মের একদিনের সমান চৌদ্দ মন্বন্তর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগের অবতারকে বলে যুগাবতার। কোনো যোগ্য জীবে শক্তি দ্বারা ভগবানের যে আবেশ তাকে শক্তাবেশাবতার বলে। সনকাদি নারদ, পৃথু, পরশুরাম প্রভৃতি ভগবানের শক্তাবেশাবতার। আবার, ঈশ্বর পৃথিবীতে স্থূল দেহধারী জীবের মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়ে যে কর্মকান্ড করেন তাকে লীলাবতার বলে। শ্রীবিষ্ণু অর্থাৎ ঈশ্বরের দশজন

লীলাবতারের নাম পাওয়া যায়। যথা– মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ এবং কল্কি। শ্রীকৃষ্ণ এই দশ অবতারের অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ এই দশাবতার ঈশ্বরের অংশ বিশেষ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ অবতার অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান। ঈশ্বরের ১০ জন লীলাবতারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ–

মৎস্য অবতারঃ

হাজার বছর আগে সত্যব্রত নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে নানা অন্যায়-অত্যাচার দেখা দেয়। তখন রাজা এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেন। তখন ভগবান মৎস্যরূপ ধারণ করে আবির্ভূত হন এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

কূর্ম অবতারঃ

পাতালবাসী অসুরেরা এক সময় দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে। তখন শ্রীবিষ্ণু সাগর মন্থন করে অমৃত তুলে দেবতাদের তা পান করে মুক্তি পাওয়ার পরামর্শ দেন এবং নিজে কূর্মের রূপ ধারণ করে দেবতাদের অমৃত মন্থনে সাহায্য করেন এবং দেবতাদের মুক্ত করেন।

বরাহ অবতারঃ

একবার পৃথিবী সাগরে ডুবে যায়। তখন ভগবান বিষ্ণু বরাহরূপে পৃথিবীকে জলের উপর তুলে ধরে রক্ষা করেন।

নৃসিংহ অবতারঃ

রাজা হিরণ্যকশিপু ছিলেন বিষ্ণু-বিদ্বেষী। আর তার পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন পরম বিষ্ণুভক্ত। রাজা নিজের পুত্রকে হত্যা করতে চাইলে শ্রীবিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করে প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। তিনি হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

বামন অবতারঃ

বলি নামের এক অসুর দেবতাদের স্বর্গরাজ্য কেড়ে নেয়। তখন শ্রীবিষ্ণু বামনের রূপ ধারণ করে বলির কাছে ত্রিপাদ ভূমি চাইলেন। বলি তা দিতে রাজী হলে তিনি বিশাল রূপ ধারণ করে এক পা স্বর্গে, এক পা মর্ত্যে এবং তৃতীয় পা বলির মস্তকে রাখলেন। বলি হতো হলো, আর দেবতারা হারানো স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন।

পরশুরামঃ

ত্রেতাযুগে রাজা কার্তবীর্যের নেতৃত্বে ক্ষত্রিয়েরা এক সময় খুব অত্যাচারী হয়ে ওঠে। তখন মহর্ষি ঋচিকের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু তাঁর পৌত্র এবং জমদগ্নির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় পরশুরাম। একদা কার্তবীর্য ধ্যানমগ্ন জমদগ্নিকে হত্যা করে। তখন পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয়দের সাথে যুদ্ধ করেন এবং তাদের পরাস্ড় করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

রামঃ

ত্রেতাযুগে রাক্ষসরাজ রাবণকে হত্যা করে রাম তাঁর স্ত্রী সীতাকে উদ্ধার করেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

বলরামঃ

দ্বাপরযুগে বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাইরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু অত্যাচারীকে পরাজিত করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

বুদ্ধঃ

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মানুষের মন থেকে হিংসা, নীচুতা দূরীভূত করে তাদেরকে শান্তির পথ দেখান এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

এইভাবে যুগে যুগে ঈশ্বর অবতাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি দুষ্টদের নাশ করেছেন এবং ধর্ম সংস্থাপন করেছেন। এর ফলে সমাজে যেমন শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে, মানুষও সুখে-শান্তিতে সমাজে বাস করতে পেরেছে।

সারসংক্ষেপ :

ঈশ্বর এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। পৃথিবীতে যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান হয় তখন ঈশ্বর অবতাররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। অবতার বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন– পুরুষাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার, শক্তাবেশাবতার, লীলাবতার ইত্যাদি। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দশ জন লীলাবতারের নাম জানা যায় – মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। এভাবে ঈশ্বর যুগে যুগে অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠ-১০.২ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলা-মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানতে পারবেন
- শ্রীকৃষ্ণের বাণী জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	বিশ্ব, অসীম, অনন্ত, স্থিতি, সংহার, পূর্ণাবতার, উত্থান, কংস, দেবকী, দৈববাণী, সংকর্ষণ, বলরাম, গোকুল, নন্দরাজ, যশোদা, মল্লযুদ্ধ, অর্ঘ্য, সুদর্শন চক্র, ইন্দ্রপ্রস্থ, পাশাখেলা, অশ্বত্থ, শর।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ :

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। তিনি বিশ্বের একমাত্র কারণ। তিনি অসীম ও অনন্ত। তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্তা। পৃথিবীতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তিনি অবতাররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পূর্ণাবতার। ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন তখন তাঁকে বলা হয় পূর্ণাবতার। শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে জন্ম গ্রহণ করার কারণ তিনি নিজেই গীতায় বলেছেন–

যথা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।। ৪/৭-৮

অর্থাৎ যখনই পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান ঘটে তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের রক্ষা, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

জন্ম ও শৈশবলীলা:

ছবি : শ্রীকৃষ্ণ

দ্বাপর যুগের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। মথুরার ভোজরাজবংশের রাজা ছিলেন কংস। তিনি তাঁর পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হন। কংসের জেঠতুতো বোন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মা দেবকী। কংস দেবকীকে শূরবংশের রাজা বসুদেবের সঙ্গে বিয়ে দেন। বিয়ের পর তিনি নিজে রথে করে দেবকী ও বসুদেবকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আকাশে দৈববাণী হলো – ওরে নির্বোধ! যাকে তুই রথে করে নিয়ে যাচ্ছিস তার অষ্টমগর্ভে সন্তান তোকে হত্যা করবে। দৈববাণী শুনে কংস অত্যন্ত রেগে গেলেন। তিনি তখনই খড়্গ নিয়ে দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু বসুদেব তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। তিনি কথা দিলেন যে তাঁদের সব সন্তানকে তিনি কংসের হাতে তুলে দিবেন হত্যা করতে। এ কথা শুনে কংস নিবৃত্ত হলেন। কিন্তু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দেবকী ও বসুবেদকে কারাগারে আটকে রাখলেন। কংস একে একে তাঁদের ছয়টি সন্তানকে হত্যা করলেন। সপ্তম সন্তান বলরাম সংকর্ষণের মাধ্যমে বসুদেবের অপর স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হলো। এবার অষ্টম সন্তান হিসেবে জন্ম গ্রহণ করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। রাতটি ছিল ভীষণ দুর্যোগময়। সব প্রহরীরা যোগমায়ার প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন। দৈবনির্দেশে বসুদেব সদ্যোজাত পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে নন্দরাজপত্নী যশোদার পাশে শয়ন করিয়ে রেখে তাঁর সদ্যোজাত কন্যাকে নিয়ে এলেন এবং দেবকীকে দিলেন। পরদিন ভোর বেলাতেই কংস অষ্টম সন্তানকে হত্যা করতে চলে এলেন। কন্যা শিশুটিকে আছাড় মারার জন্য যেই উপরে তুললেন অমনি সে উপরদিকে চলে গেল। আর যেতে যেতে কংসকে বলল – তোমাকে বধ করার জন্য স্বয়ং নারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেছেন। কংস ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি তাঁর বোন পুতনা রাক্ষসীকে পাঠালেন গোকুলের সব শিশুদের বিষাক্ত স্তন পান করিয়ে হত্যা করতে। কৃষ্ণ এমনভাবে পুতনার স্তন পান করলেন যার ফলে পুতনা মারা গেল। কংস বুঝতে পারল যে শ্রীকৃষ্ণই তাঁর শত্রু। তিনি নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। যত দিন যাচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণের লীলা ততই প্রকাশ পাচ্ছিল সবার কাছে।

কংসবধঃ

কংস কোনোভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে পারছিলেন না। পরে তিনি মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করলেন। তিনি অক্রুরকে পাঠালেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে আমন্ত্রণ জানাতে। অক্রুর তাঁদের জানালেন এবং সেই সাথে কংসের গুপ্ত অভিসন্ধির কথাও জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় এলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কংসের মল্লযোদ্ধারা প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাদের সবাইকে পরাজিত করলেন। শেষে শ্রীকৃষ্ণ কংসের চুলের মুঠি ধরে মঞ্চ থেকে নামালেন এবং মুষ্টির আঘাতে তাঁকে বধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেন, বসুবেদ ও দেবকীকে মুক্ত করলেন। উগ্রসেনকে আবার মথুরার রাজা করলেন।

জরাসন্ধবধঃ

জরাসন্ধ ছিলেন কংসের শ্বশুর। তিনিও ছিলেন অত্যন্ত অত্যাচারী। কংসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তিনি বিপুল সংখ্যক সেনা নিয়ে মথুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। বলরাম তাঁকে হত্যা করতে চাইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু তিনি আরও সাতবার মথুরা আক্রমণ করলেন এবং প্রত্যেকবারই পরাজিত হলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে দিয়ে তাঁকে হত্যা করালেন।

শিশুপালবধঃ

চেদিরাজ শিশুপাল ছিলেন অত্যন্ত অহংকারী ও অত্যাচারী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মাকে কথা দিয়েছিলেন যে তাঁর একশ অপরাধ ক্ষমা করবেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে অর্ঘ্য প্রদান করেন। শিশুপাল এতে ঈর্ষান্বিত

হন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করতে শুরু করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কথামত শিশুপালের একশ অপরাধ আগেই ক্ষমা করেছিলেন। এবার তিনি সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপালের মস্তক কেটে ফেললেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধঃ

ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডু দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্র বড় হলেও তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। তাই ছোট ভাই পান্ডু রাজা হন। আর নিয়মানুসারে পান্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদেরই রাজ্য পাবার কথা। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য ও তাঁর শতপুত্রের মোহে অন্ধ ছিলেন। তিনি হিতাহিত জ্ঞান ভুলে গেলেন। পঞ্চপান্ডবদের কোনো ক্ষতি করতে না পারায় তিনি রাজ্য দুই ভাগ করে এক অংশ তাঁর পুত্রদের এবং অপর অংশ পঞ্চ পানাডবদের দিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ হলো পান্ডবদের রাজধানী। কিন্তু অর্ধেক রাজ্য পেয়েও দুর্যোধন খুশি হলেন না। তাঁর পুরো রাজ্য চাই। কপট পাশাখেলায় পান্ডবদের পরাজিত করে তাঁদের বারো বছরের জন্য বনবাসে এবং আরো এক বছরের জন্য বনবাসে পাঠালেন। বারো বছরের বনবাস এবং এক বছরের অজ্ঞাতবাস শেষ করে ফিরে এলে দুর্যোধন পান্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। পানাডবরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরের রাজসভায় সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে গেলেন। কিন্তু দুর্যোধন প্রত্যাখ্যান করল। ফলে কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ল। কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তরে দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হলো। উভয়পক্ষের অনেক লোক, রাজা, যোদ্ধা নিহত হলো। শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত পান্ডব পক্ষ জয়লাভ করল। ধর্মপ্রাণ পান্ডবগণ হারানো রাজ্য ফিরে পেলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাঃ

ধর্মরাজ্য স্থাপন ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁর আরও একটি গৌরবময় অবদান হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এই গীতা হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বে অর্জুন অস্ত্র ত্যাগ করলেন। তিনি বললেন, 'আমি যুদ্ধ করব না। যুদ্ধ করলে পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণসহ আরও অনেক আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করতে হবে। তাছাড়া উভয়পক্ষের রাজন্যবর্গ ও সেনারাও হতো হবে। এতে দেশের অকল্যাণ হবে, অধর্মাচরণ হবে'। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মোহ দূর করার জন্য তাঁকে ধর্মের সারকথা শোনালেন এবং নিজের বিশ্বরূপ দর্শন করালেন। অর্জুনের মোহ দূর হলো। তিনি যুদ্ধে অংশ নিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে বর্ণিত ধর্মের এ সারকথাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানঃ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি বহুকাল রাজত্ব করলেন। বলরাম ধ্যানযোগে দেহ ত্যাগ করলেন। শ্রীকৃষ্ণও নশ্বর দেহ ত্যাগ করার সংকল্প করলেন। তিনি বনে গিয়ে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে বসে আছেন। তখন জরা নামে এক ব্যাধ তাকে মৃগ মনে করে তাঁর চরণে শরবিদ্ধ করল। এই শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ ইহলীলা ত্যাগ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাণী:

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। (গীতা, ২/২০)

সারসংক্ষেপ :

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। দুষ্টের দমন ও সাধুদের রক্ষা করার জন্য তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তিনি হলেন ভগবান বিষ্ণুর পূর্ণাবতার। কংসের বোন দেবকীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বসুদেব। দেবকীর গর্ভের অষ্টম সন্তান কংসকে বধ করবে এই দৈববাণী শুনে কংস দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলে বসুদেব এই বলে তাকে শান্ত করেন যে দেবকীর গর্ভের সব সন্তানকে তিনি কংসের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু দৈবপ্রভাবে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে জন্মের পরই নন্দকুলে যশোদার কাছে রেখে তার সদ্যোজাত কন্যাকে দেবকীর কাছে নিয়ে আসেন। সেই কন্যাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে তিনি আকাশের দিকে উড়ে যেতে যেতে বলেন যে কংসের হত্যাকারী গোকুলে বেড়ে উঠছেন। কংস তার বোন পুতনাকে পাঠান শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে। কৃষ্ণ মায়াবলে তাকে হত্যা করেন। এভাবে দিন যেতে থাকে আর শ্রীকৃষ্ণের লীলা বাড়তে থাকে। একে একে তিনি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপালসহ সব অত্যাচারীকে হত্যা করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কুরুক্ষেত্রে তিনি অর্জুনকে শোনান অমর বাণী যা আমাদের কাছে গীতা বলে

পরিচিত। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

পাঠ-১০.৩ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাসদেবের জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন
- ব্যাসদেবের রচনাসম্ভার সম্পর্কে জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	ব্যাসদেব, পুরাণ, উপপুরাণ, পরাশর, ধীবর, সত্যবতী, দ্বীপ, দ্বৈপায়ন, বেদব্যাস, অম্বা, অম্বালিকা, বিদুর ইত্যাদি।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব :

হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব। মহাভারত ছাড়াও তিনি আঠারোটি পুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণেরও রচয়িতা। তাঁর পিতা পরাশর মুনি ও মাতা ধীবর কন্যা সত্যবতী। ব্যাসদেবের পুরো নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। কথিত আছে যে তাঁর গায়ের রং কালো ছিল বলে তাঁর নাম হয় কৃষ্ণ। আর যমুনার তীরে কোনো এক দ্বীপে তাঁর জন্ম হয় বলে তাঁর নাম হয় দ্বৈপায়ন। এছাড়া তিনি বেদের বিভাগকর্তা বলে তাঁকে বেদব্যাসও বলা হয়। তাঁর কাল নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ আছে। ধারণা করা হয় যে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তিনি জীবিত ছিলেন।

ব্যাসদেবের জীবনের অন্যতম সেরা কৃতি মহাভারত রচনা। ব্যাসদেব যখন মহাভারত রচনা করেন, তখন তিনি গণেশকে বলেন তাঁকে লেখায় সাহায্য করতে। গণেশ শর্ত দেন যদি ব্যাসবেদ বিরামহীনভাবে তাঁর রচিত কাহিনী বলে যেতে পারেন তাহলে গণেশ তা লিখে দেবেন। ব্যাসবেদ তখন বলেন ঠিক আছে, আমি বলব। তবে লেখার আগে তোমাকে আমার বলা শ্লোকের অর্থ বুঝে নিতে হবে। গণেশ এই শর্তে রাজী হলেন এবং লিখতে আরম্ভ করলেন। তিন বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর মহাভারত রচনা সম্পন্ন হয়।

মহাভারত বিশাল গ্রন্থ। এতে প্রায় ২৪০০০ শ্লোক রয়েছে। ব্যাসদেব শুধু মহাভারত রচনা করেননি, তিনি নিজেও মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তিনি ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু ও বিদুরের পিতা। ব্যাসদেবের পিতা পরাশর মুনি তাঁর মা সত্যবতীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর সাথে সত্যবতীর বিয়ে হয়। শান্তনু ও সত্যবতীর দুই পুত্র – বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদ। চিত্রাঙ্গদ অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। বিচিত্রবীর্যও বিয়ের পর মারা যান। তখন নিয়োগ প্রথায় বংশ রক্ষার জন্য সত্যবতীর প্রথম সন্তান ব্যাসদেবের মাধ্যমে বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রী অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বার এক দাসীর গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু ও বিদুরের জন্ম হয। মহাভারতের কাহিনী পরিক্রমায় অনেকবার ব্যাসদেবের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। তিনি বিভিন্ন সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে উপস্থিত হয়ে মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রকে সদুপদেশ দিয়েছেন। তাছাড়া মহাভারত এমন একটি গ্রন্থ যা থেকে আমরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি সব ধরনের শিক্ষা লাভ করতে পারি। প্রবাদে আছে যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের সব ধরনের শিক্ষা ও জ্ঞান মতাভারতে বিধৃত আছে। তাই মহাভারতের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ তার জীবনকে সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত করে গড়ে তুলতে পারে।

মহাভারত ছাড়াও ব্যাসদেব ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, মার্কন্ডেয়পুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও ব্রহ্মাপুরাণ নামে আঠারোটি পুরাণ রচনা করেন। তিনি আদি, আদিত্য, বৃহন্নারদীয়, নারদীয়, নন্দীশ্বর, বৃহন্নন্দীশ্বর, শাম্ব, ক্রিয়াযোগসার, কালিকা, ধর্ম, বিষ্ণুধর্মোত্তর, শিবধর্ম, বিষ্ণুধর্ম, বামন, বারুণ, নারসিংহ, ভার্গব ও বৃহদ্ধর্ম নামে আঠারোটি উপপুরাণও রচনা করেন। এসব পুরাণ ও উপপুরাণ থেকে আমরা প্রাচীন ইতিহাসসহ জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য নানা উপদেশ ও শিক্ষা পেয়ে থাকি।

সারসংক্ষেপ :

হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ মহাভারত। আর এই মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব। তিনি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে জীবিত ছিলেন। তিনি শুধু মহাভারত রচনা করেননি, তিনি মহাভারতের একশটি চরিত্র। তিনি ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু ও বিদুরের পিতা। প্রায় তিন বছরের কঠোর সাধনায় তিনি মহাভারত রচনা শেষ করেন। এই মহাভারত থেকে ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক সব দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি আঠারোটি পুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণও রচনা করেছেন।

পাঠ-১০.৪ শ্রীচৈতন্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন
- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কর্মজীবন ও উপদেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	ধর্মজ্ঞান, জাতিভেদপ্রথা, কুসংস্কার, মরণোন্মুখ, নবদ্বীপ, পূর্ণিমা, শ্রীহট্ট, বৈদিক, দুরন্ত, চতুষ্পাঠী, ব্যাকরণ, অলংকার, স্মৃতি, ন্যায়, গার্হস্থ্য, কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, নালন্দা, নীলাচল, শ্রীক্ষেত্র ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্য :

পাঁচশ বছরেরও আগের কথা। তখন এ দেশের সামাজিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। মানুষের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা কমে গিয়েছিল। প্রকৃত ধর্মজ্ঞানের অভাব হয়েছিল। জাতিভেদপ্রথা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কুসংস্কারের জাতাকলে পিষ্ট হয়ে মানুষ দলে দলে অন্য ধর্ম গ্রহণ করছিল। ঠিক এই সময় মরণোন্মুখ জাতিকে বাঁচাবার জন্য শ্রীচৈতন্য মহপ্রভু অবতীর্ণ হন।

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি ফাল্গুনী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পন্ডিত জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচী দেবী। তাঁর পিতা ছিলেন বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন খুব শান্ড় ও ধার্মিক প্রকৃতির। তাঁর মাতাও ছিলেন পরম ভক্তিমতী। এঁদের উভয়েরই পৈতৃক বাড়ি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলায়। বিদ্যাশিক্ষার জন্য জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে আসেন। সেখানে নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তারপর তাঁরা স্থায়ীভাবে নবদ্বীপেই বাস করতে থাকেন।

ছবি : শ্রীচৈতন্য

জগন্নাথ মিশ্র শচীদেবীর জীবনে অনেক কষ্টের অভিজ্ঞতা ছিল। একে একে তাঁদের আটজন কন্যা সন্তান অকালে মৃত্যুবরণ করে। তারপর একটি পুত্র সন্তান হয়। তাঁর নাম বিশ্বরূপ। তিনি যৌবনেই ঘর ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। একদিন শচীদেবী ভগবদ্‌বিভোর হয়ে গঙ্গাস্নান করছিলেন। এমন সময় গঙ্গাস্রোতের উলটোদিক থেকে একটি তুলসীপাতা ভেসে এসে তাঁর নাভি স্পর্শ করল। এ ঘটনার কিছুদিন পর তাঁর গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাঁরা এই পুত্রের নাম রাখেন নিমাই। এই নিমাইই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। নিমাইয়ের দশ-এগারো বছর বয়সেই তাঁর পিতা মারা যান। বাল্যকালে নিমাই ছিলেন অত্যন্ত চঞ্চল ও দুরন্ত। কিন্তু তিনি যেমন দেখতে সুন্দর ছিলেন তেমনি মেধাবী। গঙ্গাদাস পন্ডিতের চতুষ্পাঠীতে তিনি পড়াশুনা করেন। তিনি অল্পকালের মধ্যেই ব্যাকরণ, অলংকার, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সেই তিনি পন্ডিত নিমাই বলে পরিচিতি অর্জন করেন। তিনি নিজেই টোল খুলে ছাত্র পড়াতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্রমহলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

এরপর নিমাইয়ের গার্হস্থ্য জীবনের শুরু। বল্লভাচার্যের সুলক্ষণা কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে মাতা শচীদেবী নিমাইয়ের বিয়ে দিলেন। বিয়েতে শচীদেবী কোনো পণ নিলেন না। তাঁর এই কাজ পণপ্রথার বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করল।

নিমাই যে অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটে। কেশব মিত্র নামে কাশ্মীরের এক প্রথিতযশা পন্ডিত ছিলেন। তিনি কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, নালন্দা প্রভৃতি স্থানের শ্রেষ্ঠ পন্ডিতদের শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত করে নবদ্বীপে এসে পৌঁছালেন। নবদ্বীপে এসে তিনি সেখানকার পন্ডিতদের শাস্ত্রবিচারে আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, 'হয় তর্ক বিচার করুন, না হলে জয়পত্র লিখে দিন'। তাঁর এই আহ্বানে পন্ডিতসমাজ কিছুটা ভীত হয়ে পড়ল। তখন তরুণ পন্ডিত নিমাই দিগ্বিজয়ী পন্ডিতের সম্মুখীন হলেন। গঙ্গাতীরে দুজনের মধ্যে আলাপ পরিচয় হলো। নিমাইয়ের অনুরোধে কেশব মিশ্র তৎক্ষণাৎ ঝড়ের গতিতে নিজের রচিত শতাধিক শ্লোকে গঙ্গাস্তোত্র বলে গেলেন। আর তখন নিমাই পন্ডিত শুরু করলেন শ্লোকগুলির সমালোচনা। এরপর থেকে নবদ্বীপে নিমাই পন্ডিতের প্রভাব অনেক বেড়ে যায়।

কিছুদিন পর নিমাই একবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসেন। ভ্রমণ শেষে নবদ্বীপে ফিরে তিনি জানলেন যে, স্ত্রী লক্ষ্মী দেবী সর্পদংশনে মারা গেছেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর মধ্যে সংসার বিমুখতা দেখা দেয় এবং তিনি অত্যন্ড় ধর্মানুরাগী হয়ে উঠেন। সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করতে শচীদেবী সনাতন পন্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে নিমাইয়ের আবার বিয়ে দেন।

কয়েক বছর পর নিমাই পিতার পিন্ডদানের জন্য গয়াধামে গেলেন। সেখানে ঈশ্বরপুরীর নিকট তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিলেন। সংসার ধর্ম, অধ্যাপনা ত্যাগ করে নিমাই হয়ে পড়লেন পরম কৃষ্ণভক্ত। তাঁর প্রাঙ্গণে বৈষ্ণবগণ এসে জড় হন, নামকীর্তন করেন। শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, অদ্বৈতাচার্য এঁরা সবাই ছিলেন নিমাইয়ের পার্ষদ।

একদিন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কীর্তন হচ্ছে। কীর্তন থামিয়ে হঠাৎ তিনি নন্দনাচার্যের গৃহে যান। সেখান থেকে তিনি আত্মগোপনকারী নিত্যানন্দকে নিয়ে আসেন। নিত্যানন্দ হন তাঁর প্রধান পার্ষদ। তিনি নিত্যানন্দ ও হরিদাসের মাধ্যমে নবদ্বীপে কৃষ্ণনাম প্রচার করলেন। শুরুতে কিছু বাঁধাবিঘ্ন এলেও তিনি সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করেন। তাঁর সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে থাকে।

কিছুদিন পর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের গভীর রাতে পন্ডিত নিমাই মাতা, স্ত্রী ও ভক্তদের ছেড়ে গৃহ ত্যাগ করলেন। কাটোয়ায় এসে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নিলেন। এরপর তাঁর নাম হলো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ভক্তদের অনুরোধে তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাড়িতে আসেন। মাতৃভক্ত শ্রীচৈতন্য মায়ের অনুরোধে নীলাচল থেকে জীবনের শেষ অবধি মায়ের খবরাখবর নেন।

এরপর তিনি পুরী, দাক্ষিণাত্য ও বৃন্দাবনে ঘুরে ঘুরে প্রেমভক্তি প্রচার করেন। এ সময় শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি পন্ডিত ভক্তগণ তাঁর সাথে মিলিত হন। এরপর তিনি কাশীতে ধর্ম প্রচার করেন। তিনি জীবনের শেষ আঠারো বছর নীলাচলে অতিবাহিত করেন। তাঁর কৃষ্ণপ্রেম দিন দিন আরও বাড়তে লাগল। শ্রীক্ষেত্রের পথে পথে তিনি 'কোথা কৃষ্ণ, দেখা দাও, দেখা দাও' বলে ঘুরে বেড়াতেন। এরপর ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আষাঢ় মাসে তিনি দিব্যভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করলেন। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এরপর দরজা খুলে তাঁকে আর ভিতরে পাওয়া যায়নি। ভক্তগণের ধারণা শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দেবের দেহে লীন হয়ে গেছেন।

শ্রীচৈতন্যের উপদেশ

১. যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার।।

২। কি ভোজনে কি শয়নে কি বা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

সারসংক্ষেপ :

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যনাম ছিল নিমাই। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচী দেবী। তাঁর প্রথম স্ত্রী লক্ষ্মী দেবী সর্পাঘাতে মারা গেলে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিয়ে করেন। শৈশবকাল থেকেই তাঁর পান্ডিত্য প্রকাশিত হতে থাকে। অল্প বয়সেই তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তিনি বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের নিকট থেকে শাস্ত্র শিক্ষা নেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম প্রচার করেন। তিনি সমাজ থেকে জাতিভেদপ্রথা দূর করার জন্য নিরলস কাজ করেছেন। তিনি ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি ভক্তদের উদ্দেশ্যে অনেক উপদেশ বাণী দিয়ে গেছেন।

পাঠ-১০.৫ তুকারাম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তুকারামের জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন
- তুকারামের সাধন পদ্ধতি ও রচনা সম্পর্কে জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	বরকরী, ভক্তিপথ, স্বনামধন্য, মহারাষ্ট্র, পুনে, দেহু, শতক, সমৃদ্ধ, দর্শন, গ্রীস, ইরান, চীন, বিত্থল, অভং, মারাঠি ইত্যাদি।

তুকারাম :

তুকারাম ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বরকরী সাধু এবং ভক্তিপথের একজন স্বনামধন্য কবি। তিনি ভারতের মহারাষ্ট্রের পুনে শহরের নিকটবর্তী দেহু নামে একটি ছোট শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম ছিল তুকারাম বোলহোবা আম্বিলে। কিন্তু এই নামে তাঁকে খুব কম মানুষই চিনতেন। তাঁকে সবাই সাধু তুকারাম হিসেবেই চিনতেন। তুকারামের প্রথম স্ত্রী রখুমা বাই অল্প বয়সে মারা যান। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম জিজিয়া বাই। তাঁর তিন পুত্রের নাম মহাদেব, বিথোবা এবং নারায়ণ।

বহু শতক ধরে বিশেষ করে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে খ্রিষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষ ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে বিশেষভাবে সামাজিক ও সাহিত্যিক দিক দিয়ে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হতে থাকে। এ সময় ভারতবর্ষের শিক্ষা, দর্শন ও বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। শুধু তাই নয় গ্রীস, ইরান, চীন প্রভৃতি দেশের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবেও সমৃদ্ধ হতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ করেই একাদশ শতকের পর পরিস্থিতি বদলে যেতে শুর“ করে। হঠাৎ করেই সমাজে বর্ণভেদপ্রথা ও অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কারের অতি বিস্ড়ার হতে থাকে। তথাকথিত ব্রাহ্মণ সমাজ অন্যান্য বর্ণের মানুষদের বিভিন্নভাবে হেয়ো প্রতিপন্ন করতে থাকে। এমনকি তাদের কাছ থেকে শিক্ষার অধিকারও কেড়ে নেয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির আগ্রাসন যুক্ত হয়ে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। এই নাজুক পরিস্থিতি থেকে বাঁচার তাগিদে ভারতবর্ষ জুড়ে ভক্তি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে।

ছবি : তুকারাম

এই ভক্তি সম্প্রদায়ের অন্যতম একজন সাধু ছিলেন তুকারাম। তিনি হিন্দুদর্শনের একজন স্বনামধন্য পন্ডিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিত্থলের (বিষ্ণুর একজন অবতার) উপাসক। তিনি বহু গান রচনা করেন। তাঁর রচিত এই সব গান 'অভং' নামে পরিচিত। তাঁর গ্রামের ব্রাহ্মণরা তাঁর এই বিষ্ণুর উপাসনা ও তাঁর রচিত গানকে বিভিন্ন ধর্মীয় অজুহাতে ধ্বংস করতে চেয়ে ব্যর্থ হন। তুকারামের সাধনার অন্যতম দিক ছিল বর্ণবৈষম্য দূর করা। তিনি প্রমাণ করেন যে বেদে কোনো বর্ণবৈষম্যের উল্লেখ নেই। তাঁর এই মতবাদ ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর তিনি তাঁর রচিত 'অভং' গানের মাধ্যমে এই মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর গানের মাধ্যমে তিনি মানবতা, সাম্য, পরিবেশবাদ ও ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রচার করেন।

দিলীপ পুরুষোত্তম চিত্রে নামে একজন মারাঠি পন্ডিতের মতে তুকারাম ছিলেন প্রথম আধুনিক মারাঠি কবি। তিনি হিন্দুধর্মে প্রচলিত বর্ণপ্রথাসহ প্রায় সব ধরনের কুসংস্কারের বিরোধিতা করেন।

তাঁর একটি গানের অর্থ এই রকম – নামদেব আমাকে স্বপ্ন থেকে জাগরিত করে প্রভু বিথলের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এর থেকে ধারণা করা হয় যে, নামদেব ছিলেন তাঁর গুরু। তাঁর অভং থেকে আরও জানা যায় যে তাঁর সদ্‌গুরু ছিলেন 'বাবাজী চৈতন্য'। ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে তুকারাম ইহলীলা ত্যাগ করেন।

মহাপতি তুকারামসহ মহারাষ্ট্রের অন্যান্য ধর্মীয় সাধুসন্ন্যাসীদের জীবনী নিয়ে ভক্তিবিজয় ও ভক্তিলীলামৃত নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। দিলীপ চিত্রে তুকারামের বিভিন্ন লেখাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং 'Says Tuka' নামে বইটি প্রকাশিত হয়।

সারসংক্ষেপ :

তুকারাম ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দে পুনের নিকটবর্তী দেহু শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম তুকারাম বোলহোবা আম্বিলে। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বরকরী সাধু এবং ভক্তিমার্গের একজন স্বনামধন্য কবি। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম রখুমা বাই ও দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম জিজিয়া বাই। তাঁর তিন পুত্রের নাম – মহাদেব, বিথোবা ও নারায়ণ। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন এ দেশে এক ক্রান্তিকাল চলছিল। ব্রাহ্মণ্যসমাজ ও বিদেশিদের আগ্রাসনে বর্ণভেদপ্রথা চরমে উঠেছিল। তিনি এক সাম্যের প্রতীক হয়ে এলেন। তাঁর রচিত অভং গানের মাধ্যমে প্রচার করলেন সাম্যের দর্শন। তিনি দেখালেন যে বেদে কোনো জাতিভেদপ্রথা নেই। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সাধুদের জীবনী নিয়ে ভক্তিবিজয় ও ভক্তিলীলামৃত নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইহলীলা ত্যাগ করেন।

পাঠ-১০.৬ রামপ্রসাদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রামপ্রসাদের জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন
- রামপ্রসাদের সাধনপথ সম্পর্কে জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	সংস্কৃতজ্ঞ, আয়ুর্বেদিক, চিকিৎসক, সংস্কৃত, সাহিত্য, টোল, ফার্সি, হিন্দি, উপাসক, মোহগ্রস্ত, তন্ত্রসার, সংগীত, ধ্যান, পঞ্চবটী, বট, বেল, আমলকী, অশোক, পিপল, পঞ্চমুন্ডী

রামপ্রসাদ :

রামপ্রসাদ সেন কোলকাতার নিকটবর্তী হালিশহর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম সাল নিয়ে ভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। কারও মতে তিনি ১৭১৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। আবার, অন্য একদল মনে করেন যে তিনি ১৭২৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামরাম সেন এবং মাতার নাম সিদ্ধেশ্বরী। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। রামপ্রসাদ সংস্কৃত টোল থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে জ্ঞানার্জন করেন। এছাড়া তিনি ফার্সি ও হিন্দিও শেখেন।

ছবি : রামপ্রসাদ

রামরাম সেনের ইচ্ছে ছিল যে তাঁর পুত্র রামপ্রসাদ সেনও তাঁর মতো আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হবেন। কিন্তু রামপ্রসাদের এই পেশায় কোনো আকর্ষণ ছিল না। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ভক্তিপথের প্রতি আকর্ষণ ছিল এবং তিনি মা কালীর উপাসক ছিলেন। তাঁর এই পরিস্থিতি দেখে তাঁর পিতা-মাতা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। বিয়ে দিলে রামপ্রসাদ সেন কর্তব্যনিষ্ঠ হবে ভেবে পিতা-মাতা তাঁকে বাইশ বছর বয়সে বিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সর্বাণী। বিয়ের পর তাঁদের বাড়ির আধ্যাত্মিক গুরু মাধবাচার্য তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে মন্ত্র দেন। গুরু যখন রামপ্রসাদের কানে মন্ত্র উচ্চারণ করেন তখন তিনি হঠাৎ মা কালীর ধ্যানে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এক বছর পর গুরু মাধবাচার্য মারা যান। এরপর রামপ্রসাদ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নামে একজন তান্ত্রিক যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আগমবাগীশ মা কালীর একজন পরম ভক্ত ছিলেন। 'তন্ত্রসার' নামে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

রামপ্রসাদের কোনো কাজকর্মের প্রতি আকর্ষণ ছিল না। তিনি সারাক্ষণ মা কালীর সাধনায় মগ্ন থাকতেন। এর মধ্যে তাঁর পিতা রামরাম সেন মারা যান। পুরো সংসারের দায়িত্বভার রামপ্রসাদের ওপর পড়ে। তিনি কোলকাতায় চলে আসেন। তিনি সেখানে দুর্গাচরণ মিত্র নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে হিসাবরক্ষকের কাজ নেন। কিন্তু তাঁর কাজকর্মে কোনো মন ছিল না। হিসাবের খাতার বিভিন্ন পাতা জুড়ে তিনি মা কালীর উদ্দেশ্যে ভক্তি সংগীত লিখতেন। দুর্গাচরণের অন্যান্য কর্মচারীরা রামপ্রসাদের এই কাহিনী তাঁকে জানায়। দুর্গাচরণ এসব খাতা দেখে রামপ্রসাদের ওপর রাগ না করে উলটো অত্যন্ত খুশি হন। তিনি রামপ্রসাদকে গ্রামে ফিরে গিয়ে সঙ্গীত রচনা করতে বলেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি রামপ্রসাদের মাসিক বেতন নিয়মিত তাঁকে পাঠিয়ে দিবেন।

রামপ্রসাদ গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি অধিকাংশ সময় মা কালীর সাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনায় কাটাতেন। তিনি গঙ্গায় কাঁধ পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে ধ্যান করতেন ও মা কালীর উদ্দেশ্যে গান গাইতেন। তিনি প্রত্যহ পঞ্চবটীতে সাধনা করতেন। পঞ্চবটী হলো এমন একটি স্থান যেখানে একসাথে বট, বেল, আমলকী, অশোক ও পিপল গাছের সমাহার ছিল। তিনি সেখানে পঞ্চমুন্ডী আসনে ধ্যান করতেন।

নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের রচিত গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর সভাকবি নির্বাচিত করেন। রামপ্রসাদ খুব কম সময় রাজসভায় কাটাতেন। অধিকাংশ সময় তিনি মা কালীর সাধনায় এবং তাঁর উদ্দেশ্যে গান রচনা করে কাটাতেন। তাঁর রচিত গানগুলিকে বলা হয় রামপ্রসাদী গান। এসব গান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গীতে একাধারে পল্লীগীতির সুরের সাথে বিভিন্ন রাগেরও সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর এই রীতি লক্ষ্য করে পরবর্তীতে অনেক গীতিকার ও সুরকার এই ধরনের রচনা ও তাতে সুরারোপ করেন। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং হেমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নবাব সিরাজুদ্দৌলাও রামপ্রসাদের গানে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নবাবের আমন্ত্রণে রামপ্রসাদ তাঁর রাজসভায় অতিথি হিসেবেও যান।

রামপ্রসাদ সেন বাংলায় ভক্তি সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান সাধক ছিলেন। বাংলায় শাক্ত সম্প্রদায় ও শ্যামা সঙ্গীতের প্রসারে তাঁর ভূমিকা অন্যতম। তিনি ছিলেন মা কালীর একনিষ্ঠ সাধক। কথিত আছে যে মা কালী কখনও ছোট বালিকা, কখনও অন্নপূর্ণার রূপ ধারণ করে রামপ্রসাদ সেনকে সাহায্য করেন।

রামপ্রসাদ সেনের বার্ধক্যের সময় তাঁর পুত্র রামদুলাল ও পুত্রবধূ ভগবতী তাঁর দেখাশুনা করেন। রামপ্রসাদ নবরাত্রিতে অত্যন্ত ভক্তির সাথে কালী পূজা করতেন। ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দের নবরাত্রিতে কালী পূজার পর রামপ্রসাদ সেন মায়ের মূর্তি বিসর্জন দেয়ার জন্য সবার সাথে গঙ্গায় যান। সেখানে তিনি গঙ্গায় কাঁধ পর্যন্ত জলে নেমে মায়ের পূজার ঘট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং মায়ের উদ্দেশ্যে গান গাইতে থাকেন। যে সময় মায়ের মূর্তির বিসর্জন হয়, ঠিক সেই সময়েই রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। আজও বাংলার প্রতি হিন্দু পরিবারে রামপ্রসাদী অত্যন্ত জনপ্রিয়।

সারসংক্ষেপ :

রামপ্রসাদ সেন কোলকাতার নিকটবর্তী হালিশহর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মসাল নিয়ে মতোবিরোধ আছে। কারও মতে তিনি ১৭১৮ সালে আবার কারও মতে তিনি ১৭২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামরাম সেন ও মাতার নাম সিদ্ধেশ্বরী। তাঁর পুত্রের নাম রামদুলাল ও পুত্রবধূর নাম ভগবতী। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক এবং তাঁর পিতার ইচ্ছে ছিল যে তিনিও তাই হবেন। কিন্তু তাঁর এসবের প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি ছিলেন মা কালীর একনিষ্ঠ ভক্ত। পিতার মৃত্যুর পর সংসার চালাতে তিনি কোলকাতায় চাকুরি নেন। কিন্তু কাজে তাঁর মন বসে না। হিসাবের খাতার পাতা জুরে তিনি মা কালীর নামে গান লিখেন। এসব দেখে তাঁর মালিক তাঁকে বলেন গ্রামে ফিরে গিয়ে গান লিখতে। তাঁর মাসিক বেতন যথারীতি তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হতো। তাঁর লেখা গান রামপ্রসাদী নামে পরিচিত। আজও বাংলার ঘরে ঘরে এই গান অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

পাঠ-১০.৭ রাণী রাসমণি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাণী রাসমণির জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন
- রাণী রাসমণির বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	গৃহনির্মাণ, কৃষিকাজ, জীবিকা, স্থাবর, দয়ালু, প্রজাহিতৈষী, সাফল্য, অনশন, দানশীলা, ধর্মানুরাগিণী, আহিরীটোলা, মুমূর্ষু, যাত্রী, শুশ্রূষাকারী, হীরক, মুসুড়ি, মেটিয়াবুরুজ, টোনারখাল, মধুমতী, নবগঙ্গা, ভক্তিমতী ইত্যাদি।

রাণী রাসমণি :

রাণী রাসমণি বাংলা ১২০০ (১৭৯৩ খ্রি.) সালের ১১ আশ্বিন বুধবার কোলকাতার উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরে হালিশহরের নিকটে কোনো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস এবং মাতার নাম রামপ্রিয়া দাসী। তিনি ছিলেন দরিদ্র পরিবারের কন্যা। তাঁর পিতা গৃহনির্মাণ ও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। জন্মের পর তাঁর মা নাম রাখেন রাণী। পরে তাঁর নাম হয় রাসমণি। এরপর এ দুটি নাম একত্রিত করে তিনি গ্রামবাসীদের কাছে রাণী রাসমণি নামে পরিচিত হন।

বাংলা ১২১১ সালের ৮ বৈশাখ জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সাথে রাণী রাসমণির বিয়ে হয়। রাজচন্দ্র দাসের বাবার নাম ছিল প্রীতরাম দাস। তিনি ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। তখন তাঁর রেখে যাওয়া স্থাবর সম্পত্তি ও সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার মালিক হন রাজচন্দ্র। তিনি ছিলেন দয়ালু ও প্রজাহিতৈষী। আর তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন স্ত্রী রাণী রাসমণি। এতে তাঁর সাফল্য আরও বাড়তে থাকে। তাঁদের চারজন কন্যা সন্তান ছিল। ওদের নাম পদ্মামণি, কুমারী, করুণা এবং জগদম্বা। তবে রাজচন্দ্র ও রাসমণির দাম্পত্য জীবন খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১২৪৩ সালে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজচন্দ্র মারা যান। স্বামীর মৃত্যুশোকে রাসমণি তিন দিন তিন রাত্রি অনশনে কাটান। প্রচুর অর্থ ব্যয়ে তিনি স্বামীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। নিজের দেহের সমপরিমাণ টাকা তিনি আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের দান করেন।

ছবি : রাণী রাসমণি

স্বামীর মৃত্যুর পর সমস্ড় রাজকার্যের দায়িত্ব রাণী রাসমণির ওপর এসে পড়ে। তিনি ছিলেন অত্যন্ড় দানশীলা ও ধর্মানুরাগিণী। স্বামীর মৃত্যুর আগে ও পরে তিনি জনসাধারণের কল্যাণের জন্য অনেক কাজ করেছেন। ১২৫০ সালের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের বহু পরিবার সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ে। রাণী রাসমণি অনেক টাকা খরচ করে এদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। ঐ বছরই তাঁর পিতা মারা যান। চতুর্থী করার জন্য রাণী গঙ্গার ঘাটে যান। গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার রাস্ড়া যেমন ছিল ভাঙাচোরা, তেমনি গঙ্গার ঘাটও ছিল কাদাযুক্ত বিপজ্জনক। তিনি তাঁর স্বামী রাজচন্দ্রকে বলে এই রাস্তা ও ঘাট মেরামত করান। এই রাস্তার নাম হয় বাবুরোড এবং ঘাটের নাম হয় বাবুঘাট। এছাড়াও রাজচন্দ্র মায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য আহিরীটোলার গঙ্গায় একটি ঘাট প্রস্তুত করেন। নিমতলায় মুমূর্ষু গঙ্গা যাত্রীদের জন্য গৃহ নির্মাণ করেন, সেখানে চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর বিষয়কার্যে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হলেও তিনি নিয়মিত পূজার্চনা করতেন। দৈনিক পূজার্চনা করা ছাড়াও তিনি মহাসমারোহে বিভিন্ন উৎসব পালন করতেন। ১২৪৫ সালে তিনি ১,২২,১১৫ টাকা খরচ করে রৌপ্যময় রথ নির্মাণ করেন এবং কোলকাতার রাস্তায় ঐ রথে বসিয়ে জগন্নাথ দেবকে ভ্রমণ করান। এ সব ব্যবস্থা করতে জামাতা মথুরা মোহন বাবু তাঁকে সাহায্য করেন।

একবার রাণী রাসমণি পুণ্যভূমি জগন্নাথ ক্ষেত্রে যান। সেখানকার রাস্তাঘাট খুব ভাঙাচোরা ছিল। তিনি তীর্থযাত্রীদের জন্য ঐ রাস্ড়াটি সংস্কার করে দেন। তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই তিন বিগ্রহের জন্য তিনটি হীরক খচিত মুকুট তৈরি করে দেন।

সরকার এক সময় গঙ্গায় মাছ ধরার জন্য কর নির্ধারণ করে দেন। জেলেরা নিরূপায় হয়ে রাণী রাসমণির নিকট যায়। তিনি দশ হাজার টাকা দিয়ে মুসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজের সীমা পর্যন্ত সমস্ত গঙ্গা জমা নেন এবং রশি টানিয়ে জাহাজ ও নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেন। সরকার আপত্তি করলে তিনি বলেন, জাহাজ চলাচল করলে মাছ অন্যত্র চলে যাবে এবং জেলেদের তাতে ক্ষতি হবে। পরে সরকার বাধ্য হয়ে জলকর তুলে নেন। এভাবে রাণি রাসমণির সাহায্যে জেলেদের দুঃখ দূর হয়।

মকিমপুর পরগনায় একজন নীলকর সাহেব উৎপীড়ন শুরু করেছিলেন। রাণী তাঁর উৎপীড়ন বন্ধ করেন। তিনি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য এক লক্ষ টাকা খরচ করে 'টোনার খাল' খনন করেন। এই খাল মধুমতী নদীর সাথে নবগঙ্গার সংযোগ সাধন করে তিনি সোনাই, বেলিয়াঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার স্থাপন করেন। কালীঘাট নির্মাণ করে তিনি প্রভূত যশের অধিকারিণী হন।

১২৫৪ বঙ্গাব্দে তিনি কাশীধামে বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। আত্মীয়-স্বজন, খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সহযোগে পঁচিশটি বজরা প্রস্তুত করলেন। কিন্তু যাত্রার পূর্বরাত্রে রাণী রাসমণি স্বপ্নযোগে মা কালীর আদেশ পেলেন – 'কাশী যাওয়ার আবশ্যকতা নেই, ভাগীরথীর মনোরম প্রদেশে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমি ঐ মূর্তিকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হয়ে তোমার নিকট থেকে নিত্য পূজা গ্রহণ করব"। স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন এবং মন্দির ও তৎসংলগ্ন সম্পত্তি তাঁর গুরুদেবকে দান করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বড় ভাই শ্রীরামকুমারকে পূজারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এরপর শ্রীরামকুমারের মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজারী নিযুক্ত করা হয়।

ভক্তিমতী রাণী রাসমণি সারা জীবন ধর্ম ও জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর দানপত্র করে দেন। তার পরের দিন রাণী রাসমণি ইহধাম ত্যাগ করেন।

সারসংক্ষেপ :

রাণী রাসমণি ১২০০ সালের ১১ আশ্বিন হালিশহরে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরেকৃষ্ণ

দাস ও মাতার নাম রামপ্রিয়া দাসী। ১২১১ সালের ৮ বৈশাখ জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর চার কন্যার নাম – পদ্মামণি, কুমারী, করুণা ও জগদম্বা। ১২৪৩ সালে তাঁর স্বামী মারা যান। সমস্ত রাজকার্যের দায়িত্ব পরে তাঁর ওপর। তিনি ছিলেন স্বামীর মতো অত্যন্ড় প্রজাবৎসল। তিনি প্রভূত জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম করেন। ১২৫০ সালের খরায় জনগণকে সাহায্য করেন, গঙ্গার ঘাট ও রাস্ড়া মেরামত করেন, গঙ্গাযাত্রীদের জন্য পথে চিকিৎসা ও খাবারের ব্যবস্থা করেন, গঙ্গার জল লিজ নিয়ে জেলেদের মাছ ধরার ব্যবস্থা করে দেন, নীলচাষীদের অত্যাচার বন্ধ করেন, পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা মেরামত করে দেন। তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা। এভাবে তিনি তাঁর দানক্রিয়া ও ভক্তির মাধ্যমে জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান হয়।

পাঠ-১০.৮ শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের সাধনার দ্বাদশ আজ্ঞা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	কৃষ্ণপক্ষ, ত্রয়োদশী, বারুণী, মৈথিলী, বৈষ্ণব, অলৌকিক, ব্রজ, ভাবুক, বর্ণমালা, আত্মস্থ, প্রখর, গ িবদ্ধ, আহ্বান, গোচারণ, অন্তরঙ্গ, ভজন, রাখাল, গোষ্ঠ, বিসূচিকা, ভেদবমি, আধ্যাত্মিক, মতুয়া, মনুষ্যত্ব, আত্মোন্নতি ইত্যাদি।

শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর :

হরিচাঁদ ঠাকুর বাংলা ১২১৮ সনের (১৮১১ খ্রি.) ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে মহা বারুণী স্নানের শুভদিনে গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যশোমন্ড় ঠাকুর এবং মাতার নাম অন্নপূর্ণাদেবী। যশোমন্ত ঠাকুর ছিলেন মৈথিলী ব্রাহ্মণ এবং ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তাঁর গৃহে সাধু বৈষ্ণবদের সমাগম হতো। হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। বৈষ্ণবদাস, গৌরীদাস ও স্বরূপদাস নামে তাঁর আরও তিনজন পুত্র ছিলেন। এঁরা সবাই বৈষ্ণব ছিলেন।

ছবি : শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর

হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মের আগে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তাঁর মা অন্নপূর্ণা দেবীর একদিন ভাবাবেশ হয়। তিনি দেখতে পান ব্রজের শিশু কৃষ্ণ যেন তাঁকে 'মা' 'মা' বলে ডাকছে আর তাঁর কোলে এসে বুকের দুধ পান করছে। তিনি তাঁর স্বামীকে ঘটনাটি জানালেন। ঐ দিন দুপুরে সাধু রমাকান্ত এলেন তাঁদের বাড়িতে। তিনি অন্নপূর্ণা দেবীকে মা বলে ডাকতেন। অন্নপূর্ণা দেবীর ভাবাবেশের ঘটনা শুনে তিনি বললেন, –' মা তোমার গর্ভে বাসুদেব জন্মগ্রহণ করবেন'। এর কিছুদিন পরই হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন।

ছোটবেলা থেকেই হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। তিনি মাত্র কয়েক মাস বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তিনি সমস্ত বর্ণমালা ও গাণিতিক সংখ্যা আত্মস্থ করে ফেলেন। তাঁর ছিল প্রখর মেধা। কিন্তু বিদ্যালয়ের গন্ডিবদ্ধ পাঠ তাঁর ভালো লাগল না। প্রকৃতির উদার আহ্বান তাঁকে ব্যাকুল করে তুলল। তিনি মাঠে রাখাল বন্ধুদের সাথে গোচারণ

করিয়ে, খেলাধুলা করে সময় কাটাতে লাগলেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল ব্রজ, নাটু ও বিশ্বনাথ। তিনি খুব ভালো ভজন গাইতেন। তাঁর ভজন শুনে সবাই অনেক আনন্দ পেত। রাখাল বালকের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তারা সবাই তাঁকে রাখাল রাজা বলে ডাকত।

ঠাকুরের অলৌকিকত্বঃ

তিনি ছিলেন অলৌকিক গুণের অধিকারী। একদিন তিনি গোষ্ঠে গিয়ে দেখলেন বিশ্বনাথ আসেনি। খবর নিয়ে জানতে পারলেন বিশ্বনাথের বিসূচিকা (কলেরা) রোগ হয়েছে, ভেদবমি হচ্ছে। তিনি তখনই বিশ্বনাথের বাড়ি গেলেন। বিশ্বনাথের মা কাঁদতে কাঁদতে বলেন – হরি, বিশা বুঝি আর বাঁচে না, আজ ছেঁড়ে যায় তাঁর বিশ্বনাথ। হরিচাঁদ ঠাকুর বললেন –'আইলাম বিশারে কিনিতে'। এই বলে বিশ্বনাথের হাত ধরে বললেন – 'চল গোষ্ঠে যাই'।

"এত বলি হস্ত ধরি বিশারে তুলিল।

নিদ্রাভঙ্গে যেন বিশে গোষ্ঠেতে চলিল"।

এই ঘটনা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। দলে দলে লোক তাঁর কাছে নিরাময় আশায় আসতে লাগল। তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে সবাইকে চিকিৎসা দিতেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের মতবাদঃ

শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর কোনো নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেননি। তিনি মহাপ্রভু প্রবর্তিত প্রেমভক্তির বহমান ধারাকে আরও সহজভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই মতবাদের নাম 'মতুয়াবাদ'। আর এই মতবাদের অনুসারীদের বলা হয় 'মতুয়া'। হরিনামে যারা থাকে তারাই মতুয়া। মতুয়া সম্প্রদায় শঙ্কর প্রবর্তিত একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। নাম সংকীর্তন তাঁদের সাধন ভজনের পথ। তারা বিশ্বাস করে যে ভক্তিতেই মুক্তি। এই সাধন পথের মূলকথা হচ্ছে মনুষ্যত্ব অর্জন, আত্মোন্নতি এবং সার্বিক কল্যাণের জন্য সাধনা। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা – এই তিনটি স্তম্ভের ওপর মতুয়াবাদ প্রতিষ্ঠিত। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ তাঁকে বিষ্ণুর অবতার মনে করতেন। তাদের ভাষায়–

"রাম হরি কৃষ্ণ হরি হরি গোরাচাঁদ।

সর্ব হরি মিলে এই পূর্ণ হরিচাঁদ।।"

হরিচাঁদ ঠাকুরের আদর্শঃ

হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর ভক্তদের সংসারী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেও সংসারী ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। তিনি এদেশের অবহেলিত সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ ও সনাতন ধর্মে একনিষ্ঠ থাকার প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর জীবন ও আদর্শ নিয়ে হরিভক্ত তারকচন্দ্র সরকার 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১২৮৪ সনের (১৮৭৭ খ্রি.) ২৩ ফাল্গুন শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ইহলীলা সংবরণ করেন।

হারিচাঁদ ঠাকুরের সাধনার দ্বাদশ আজ্ঞা:

১. সদা সত্য কথা বলবে।

২. পিতা-মাতাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে।

৩. নারীকে মাতৃজ্ঞান করবে।

৪. জগৎকে প্রেম করবে।

৫. সকল ধর্মে উদার থাকবে।

৬. জাতিভেদ করবে না।

৭. হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে।

৮. প্রত্যহ প্রার্থনা করবে।

৯. ঈশ্বরে আত্মদান করবে।

১০. বহিরঙ্গে সাধু সাজবে না।

১১. ষড়রিপু বশে রাখবে।

১২. হাতে কাম, মুখে নাম করবে।

সারসংক্ষেপ :

শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ১২১৮ সনের ফাল্গুন মাসে গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যশোমন্ড় ঠাকুর ও মাতার নাম অন্নপূর্ণা দেবী। তিনি ছিলেন দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। তিনি স্কুলে গিয়ে মাত্র সাত দিনে সমন্ড় বর্ণমালা ও গাণিতিক সংখ্যা আত্মস্থ করে ফেলেন। তাঁর ছিল প্রখর মেধা। কিন্তু এসব তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তিনি মাঠে বন্ধুদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন ও ভজন গান করতেন। একদিন তাঁর বন্ধু বিশ্বনাথ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তিনি বিশার বাড়ি গিয়ে তার হাত ধরে বললেন, চল বিশা গোষ্ঠে যাই। বিশা তাঁর হাত ধরে গোষ্ঠে চলল। এভাবে তাঁর অলৌকিকত্ব প্রকাশ পায়। তিনি কোনো নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেননি। প্রেমভক্তির বহমান ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর এই ধারা মতুয়াবাদ নামে পরিচিত। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা এই তিন স্তম্ভের ওপর এই মতুয়াবাদ প্রতিষ্ঠিত। তিনি ১২৮৪ সনের ২৩ ফাল্গুন ইহধাম ত্যাগ করেন।

পাঠ-১০.৯ শ্রীরামকৃষ্ণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন
- শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপথ ও উপদেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	গয়াধাম, বালক, প্রকৃতি, ভাবাবেশ, উড়ন্ড়, বলাকা, আত্মসম্বিত, ভাবাচ্ছন্ন, কীর্তন, রামপ্রসাদী, কমলাকান্ত, খড়্গ, জ্যোতির্ময়, দিব্যোন্মাদনা, তান্ত্রিক, যোগী, সাকার, নিরাকার, অনুশীলন, লোকগুরু, শিষ্যত্ব ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ :

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী। তিনি ছিলেন মা-বাবার চতুর্থ সন্তান।

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা এক সময় গয়াধামে গিয়েছিলেন। সেখানকার তীর্থ দেবতা গদাধর তাঁকে স্বপ্নে বললেন, 'আমি তোর ভক্তি ও নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি শ্রীঘ্রই তোর ঘরে জন্মগ্রহণ করব।' এর কিছুদিন পর রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ক্ষুদিরাম স্বপ্নের কথা মনে রেখে তাঁর নাম রাখেন গদাধর। পরে এই গদাধরই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে পরিচিতি লাভ করেন।

ছবি : শ্রীরামকৃষ্ণ

বালক গদাধর দেখতে ছিলেন খুব সুন্দর। স্কুলে লেখা পড়ায় তাঁর মন বসত না। প্রকৃতি ছিল তাঁর খুব পছন্দের। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে মাঝে মাঝেই তাঁর ভাবাবেশ হতো। আকাশে উড়ন্ত বলাকার ঝাঁক দেখে তিনি আত্মসম্বিত হারিয়ে ফেলতেন। যাত্রাগানে শিব সাজতে গিয়ে তিনি ভাবাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। ভজন-কীর্তন গানের প্রতিও তাঁর অনেক আকর্ষণ ছিল। লোকমুখে শুনে শুনে তিনি স্তব-স্তোত্র, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী আয়ত্ত করে ফেলেন। তিনি সাধু-বৈষ্ণবদের দলে মিশে গিয়ে তাঁদের আচরণ লক্ষ্য করতেন। তাঁদের নিকট ভজন শিখতেন।

পিতার মৃত্যুর পর বড় ভাই রামকুমার রামকৃষ্ণকে নিয়ে কোলকাতায় আসেন। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরে তিনি পূজারী হিসেবে নিয়োগ পান। তাঁর মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ ঐ মন্দিরের পূজারী হন। এখানেই রামকৃষ্ণের সাধন জীবনের সূচনা হয়। তিনি মা কালীর সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দেন। মন্দিরে বসে তিনি মাকে রামপ্রসাদী ও কমলাকান্তের গান শুনাতেন। তিনি আকুল হয়ে সারাক্ষণ 'মা' 'মা' বলে ডাকতেন। মায়ের দর্শন না পেয়ে তিনি মায়ের হাতের খড়্গ নিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে গেলেন। তখন জ্যোতির্ময়রূপে মা আবির্ভূত হয়ে দেখা দিলেন।

এভাবে মায়ের উপাসনা করতে করতে তাঁর দিব্যোন্মাদনার ভাব বেড়ে গেল। এ খবর শুনে তাঁর মা চন্দ্রমণি দেবী এসে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাঁর বিয়ে দেয়ার জন্য পাত্রী খুঁজতে লাগলেন। তখন রামকৃষ্ণ নিজেই বললেন, 'জয়রামবাটির রাম মুখুজ্যের বাড়িতে খুঁজে দেখো গে। সেখানে বিয়ের কনে আছে'। সত্যিই সেখানে কনের সন্ধান মিলল। সারদাদেবীর সঙ্গে রামকৃষ্ণের বিয়ে হলো। সারদাদেবীও স্বামীর মতো ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণকে সাধনায় সাহায্য করতেন।

বিয়ের পর রামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। ১৮৬১ সালের শেষের দিকে সিদ্ধা ভৈরবী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে গুরূপদে বরণ করেন এবং তাঁর নিকট তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই ভৈরবীই গদাধরকে অসামান্য যোগী ও অবতার পুরুষ বলে আখ্যায়িত করেন। এরপর তিনি সন্ন্যাসী তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। এছাড়াও তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাধনপথ যেমন– শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বৈদান্তিক প্রভৃতি অনুসরণ করে সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি ইসলাম ও খ্রিষ্টান ধর্মের সাধনপথ অনুসরণ করেও সাধনা করেন। তাঁর এই বহুমুখী সাধনা দেখেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন–

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধ্যেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।।"

এসব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে রামকৃষ্ণ উপলব্ধি করলেন যে, ঈশ্বরের ভাব অনন্ত। সাকারও তিনি, নিরাকারও তিনি। প্রত্যেক ধর্মের নির্ধারিত সাধন পদ্ধতি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করলে তাতেই ঈশ্বর লাভ সম্ভব। তিনি তাঁর উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করে বললেন, 'যত মত তত পথ'।

১৮৭৫ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। এবার তিনি শুধু সিদ্ধ সাধু পুরুষ নন। তিনি হলেন লোকগুরু। কোলকাতায় শিক্ষিত সমাজসহ দলে দলে লোক তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শোনার জন্য ভিড় করে। মনীষী বাগ্মী কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক জটিল তত্ত্ব গল্পের মাধ্যমে সহজ সরলভাবে ব্যক্ত করতেন। দিনে দিনে তাঁর খ্যাতি বাড়তে লাগল। একদিন তাঁর নিকট এলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাতে সংশয়াকুল তরুণ নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মশাই, আপনার কি ঈশ্বর দর্শন হয়েছে?" উত্তরে ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হয়েছে। তোকে যেমন দেখছি, তার

চেয়েও স্পষ্ট দেখেছি। তুই যদি দেখতে চাস, তোকেও দেখাতে পারি।" নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃপায় ঈশ্বর দর্শন করলেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এই নরেন্দ্রনাথই স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু উপদেশ দেননি, তিনি নিজেও এসব উপদেশ পালন করতেন। তিনি জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করতেন। কালীবাড়ির ভিক্ষুকদের তিনি নারায়ণ জ্ঞানে নিজ হাতে ভোজন করাতেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট এই মহাপুর"ষের মহাপ্রয়াণ হয়। ঐদিন গভীর রাতে তিনি তিনবার মহামন্ত্র 'কালী' 'কালী' উচ্চারণ করে সমাধিস্থ হন। এই সমাধিই মহাসমাধিতে পরিণত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশ:

১. পিতাকে ভক্তি কর, পিতার সঙ্গে প্রীতি কর।
জগৎরূপে যিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন, তিনিই মা।
জননী, জন্মস্থান, বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে,
তার ধর্ম ছাই হয়ে যাবে।

২. আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভেতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছানো যায়। 'যত মত তত পথ।'

সারসংক্ষেপ :

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী। তাঁর স্ত্রীর নাম সারদা দেবী। তাঁর পিতা একবার গয়াধামে গেলে সেখানকার ইষ্টদেবতা গদাধর স্বপ্নে তাঁকে বলেন যে আমি শীঘ্রই তোর ঘরে আসব। এর কিছুদিন পরই রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। পিতা তাঁর নাম রাখেন গদাধর। পিতার মৃত্যুর পর বড় ভাই রামকুমার তাঁকে নিয়ে কোলকাতার দক্ষিণেশ্বরে আসেন। বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের পূজারী নিযুক্ত হন। তিনি সিদ্ধা ভৈরবী যোগেশ্বরীর কাছে দীক্ষা নেন। পরে তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেন। তিনি হিন্দুধর্মের অন্যান্য সাধনপথ যেমন শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বৈদান্ড়িক ইত্যাদি বিষয়েও সিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লোকগুরু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অনেক জ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তি তাঁর নিকট শিক্ষা নিতে আসতেন। মন্দিরে পূজা করার পাশাপাশি তিনি মাকে রামপ্রসাদী ও কমলাকান্তের গান শোনাতেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট এই দীব্যপুরুষ ইহধাম ত্যাগ করেন।

পাঠ-১০.১০ স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন
- তাঁর সাধনা ও রচনাবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	শিশুকাল, আমোদপ্রিয়, বাজনা, বুদ্ধিমান, সরল, স্মরণশক্তি, সাক্ষাৎ, সাধক, দীক্ষিত, গৃহত্যাগী, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগধাম, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, রাজপুতনা, ভ্রমণ, কন্যাকুমারী, দারিদ্র্য, কুশিক্ষা, শিলাখন্ড, শিকাগো, বক্তৃতা, ভগিনী, ভ্রাতৃবৃন্দ, সম্বোধন, বিবাদ, সমন্বয়, সাইক্লোনিক, অমৃত ইত্যাদি।

স্বামী বিবেকানন্দ :

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। তিনি ছিলেন মা-বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান। মহেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র নামে তাঁর আরও দুজন ভাই ছিলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ছবি : স্বামী বিবেকানন্দ

নরেন্দ্র শিশুকাল থেকে অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ছিলেন। তিনি গান-বাজনা করতে ভালোবাসতেন। তিনি খুব বুদ্ধিমান ও সরল ছিলেন এবং তাঁর ছিল প্রখর স্মরণশক্তি। দিনে দিনে তিনি বড় হতে লাগলেন এবং তাঁর চিন্তা-ভাবনারও পরিবর্তন ঘটতে লাগল। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বি. এ পাস করার পর তাঁর এই পরিবর্তন আরও চোখে পড়তে লাগল। তিনি সারাক্ষণ ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকেন। ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? এই সবই ছিল তাঁর জিজ্ঞাসা। অনেক পন্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকেও তিনি যথার্থ উত্তর পাননি। অবশেষে তিনি সাক্ষাৎ পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ঈশ্বর দেখেছেন।' উত্তরে রামকৃষ্ণ বললেন, 'দেখেছি, তোকেও দেখাতি পারি'। সাধক রামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রের ভালো লাগল। তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হলেন। তাঁর নাম হল বিবেকানন্দ। ভক্তরা তাঁকে ডাকত স্বামী বিবেকানন্দ বলে।

বিবেকানন্দ সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ালেন। তিনি কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, প্রয়াগধাম, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ শেষে কন্যাকুমারীতে পৌঁছালেন। এই ভ্রমণকালে তিনি দেখলেন ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থা খুব খারাপ। চারদিকে শুধু দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষায় ভরা। তিনি দেশবাসীকে উদ্ধার করার উপায় খুঁজতে লাগলেন। কন্যাকুমারীতে ভারতবর্ষের শেষ শিলাখন্ডে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল গুরুর বাণী, 'যত্র জীব তত্র শিব'। তিনি উপলব্ধি করলেন ভারতের জীবনীশক্তির উৎস হচ্ছে ধর্ম। কাজেই জীবকে ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করার ধর্মমন্ত্রে ভারতবাসীকে দীক্ষিত করতে হবে। তবেই ভারতের উন্নতি হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দান। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আমেরিকায় যান। বক্তৃতার শুরুতে সব বক্তাই প্রথাগতভাবে 'ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ' বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু বিবেকানন্দ বক্তৃতার শুরুতে উপস্থিত সকলকে 'ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলে সম্বোধন করলেন। সভাপক্ষের সবাই অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর বক্তৃতায় তিনি বললেন, 'হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মেরই

লক্ষ্য এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক – ঈশ্বর লাভ। তাই 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।' খ্রিষ্টানকে বৌদ্ধ হতে হবে না; অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রিষ্টান হতে হবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলো গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে এবং নিজস্ব বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজ প্রকৃতি অনুসারে বিকাশলাভ করবে'। তাঁর এই বক্তৃতায় সবাই মুগ্ধ হয়ে যান। ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠবক্তা। এই বক্তৃতার পর আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বিবেকানন্দ ধর্মদর্শনে, বিশেষজ্ঞ বেদান্ত-দর্শন ও মানবধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এরপর তিনি ইউরোপের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে বক্তৃতা করেন। তিনি নিউইয়র্কে 'বেদান্ত সমিতি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেশী সংবাদপত্রগুলো তাঁকে 'সাইক্লোনিক হিন্দু' বলে অভিহিত করেন। বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদান করে তিনি হয়ে উঠলেন বিশ্ববরেণ্য আচার্য। আয়ারল্যান্ডের মার্গারেট এলিজাবেথ তাঁর দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন এবং বিবেকানন্দের নিকট দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা। চার বছর পর ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ দেশে ফিরে আসেন। দেশের মানুষ তাঁকে মহাসমাদরে বরণ করে নিলেন। স্বামীজীও মন দিলেন দেশের মানুষের হিতসাধনে। তিনি দেশের যুব সমাজকে বললেন, 'ওঠ, জাগ, শ্রেয়কে লাভ কর। মনে রাখবে দুর্বলতাই পাপ। দুর্বলতা দূর করে শক্তি সঞ্চয় কর। তোমরা অমৃতের সন্তান। তোমাদের মধ্যে রয়েছে ঐশ্বরিক শক্তি। সব জীবের মধ্যেই ঈশ্বর অবস্থান করেন'। তাই তিনি বলেছেন–

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।।'

বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। সৎ হওয়া ও সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ। নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদের ভাই। এদের সেবাই পরম ধর্ম। আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস – এ দুটি জিনিসই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু ধর্ম প্রচার করেননি, সমাজ সংস্কার এবং দেশের উন্নয়নের কথাও ভেবেছেন। তিনি তাঁর গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায় রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠটি বেলুড় মঠ নামে পরিচিত। পৃথিবীব্যাপী শত শত মানুষকে এই মঠ ও মিশনের মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসা, আপৎকালীন সাহায্য ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশেও রামকৃষ্ণ মিশন আছে এবং এর প্রধান কেন্দ্র ঢাকার গোপীবাগে।

এই ব্রহ্মজ্ঞানী ও মানবপ্রেমিক মহাসাধক ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ জুলাই মাত্র ৪০ বছর বয়সে বেলুড় মঠে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন নিখিল মানবজাতির পরম বান্ধব। তাঁর রচিত কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের অমূল্য সম্পদ।

সারসংক্ষেপ :

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর অপর দুই ভাইয়ের নাম – মহেন্দ্র ও উপেন্দ্র। তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আমোদপ্রিয় এবং গান-বাজনা করতেও খুব ভালোবাসতেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বি.এ পাস করার পর থেকেই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকভাব বাড়তে থাকে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দীক্ষা নেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান এবং উপলব্ধি করেন যে ভারতবর্ষের মানুষ অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তিনি কন্যাকুমারীতে ধ্যানমগ্ন হন। সিদ্ধিলাভ করে তিনি ফিরে আসেন এবং মানুষের মাঝে প্রচার করেন সাম্যের বাণী। তিনি ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে বক্তৃতা দিয়ে শ্রেষ্ঠ বক্তা হন। এরপর তিনি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে বক্তৃতা শেষ করে ১৮৯৭ সালে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর কর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে আয়ারল্যান্ডের মার্গারেট এলিজাবেথ তাঁর কাছে দীক্ষা নেন এবং তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা। তিনি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই এই মহৎপ্রাণ সাধকের জীবনাবসান হয়।

পাঠ-১০.১১ শ্রীমা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রীমার জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন
- তাঁর সাধনপথ ও মানবতার কল্যাণের জন্য কৃতকর্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	ফ্রান্স, প্যারিস, অরবিন্দ, পন্ডিচেরী, শৈশবকাল, পার্থিব, বিভোর, ধ্যানমগ্ন, পাখি, খরগোশ, নিবিড়, আলজিরিয়া, প্লেমসন, হঠযোগ, গুপ্তবিদ্যা, ফরাসি, আর্য, বেশভূষা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, অরোভিল, মহীয়সী ইত্যাদি।

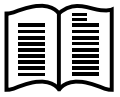

শ্রীমা :

শ্রীমা ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের প্যারিস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে মীরা বলে ডাকতেন। ভারতের পুচিেরীতে অরবিন্দ আশ্রমে আসার পর ভক্তরা তাঁকে শ্রীমা নামে ডাকত। শৈশবকাল থেকেই শ্রীমার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব জেগে ওঠে। পড়াশুনার প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। শুধু পড়াশুনা নয় পার্থিব কোনো জিনিসের প্রতিই তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। সারাক্ষণ তিনি ঈশ্বর চিন্ড়ায় বিভোর থাকতেন। চার বছর বয়স থেকেই তিনি মাঝে মাঝে ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। প্যারিস শহরের বাইরে একটি বনে তিনি গাছের নীচে ধ্যানে বসতেন। তাঁর উপর দিয়ে পাখি উড়ে যেত, খরগোশ লাফাত কিন্তু তিনি খেয়ালই করতেন না। প্রকৃতি ও পশু-পাখির সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

উনিশ বছর বয়সে তিনি আলজিরিয়ার প্লেমসন শহরে যান। সেখানে তেঁও নামে এক বিখ্যাত পুতির নিকট হঠযোগ ও গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা করেন। দেশে ফিরে তিনি আরও গভীরভাবে ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি উপলব্ধি করেন ঈশ্বর জ্যোতির্ময় এবং তাঁর সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক আছে। একবার তিনি স্বপ্নে এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখতে পেলেন। তিনি শ্রীমাকে বললেন, 'ওঠ, আরও উপরে ওঠ। সকলকে ছাড়িয়ে উপরে ওঠ, কিন্তু সকলের মাঝে ব্যাপ্ত করে দাও নিজের আত্মাকে।'

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীমা স্বামী মঁসিয়ে পল রিশারকে নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ভারতবর্ষে ঘুরতে ঘুরতে পন্ডিচেরীতে অরবিন্দের আশ্রমে আসেন। সেখানে ঋষি অরবিন্দকে দেখে তাঁর স্বপ্নে দেখা সেই পুরুষের কথা মনে পড়ল। এই আশ্রমে তিনি তাঁর সকল সাধনার সিদ্ধি খুঁজে পেলেন। তাঁরা দুজনেই অরবিন্দের কাছে দীক্ষা নিলেন। অরবিন্দের সাধনার সঙ্গী হলেন। আশ্রমে থেকে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত 'আর্য' পত্রিকার প্রকাশনার ব্যাপারেও সাহায্য করতে লাগলেন। এর কিছুদিন পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হলে তাঁরা প্যারিসে ফিরে যান।

এরপর প্রায় পাঁচ বছর পর অরবিন্দের আহ্বানে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল তিনি আবার পন্ডিচেরীতে আশ্রমে ফিরে আসেন। ইউরোপীয় বেশভূষা ত্যাগ করে ভারতীয় পোশাক পড়তে শুরু করেন। শুরু করেন নিয়মিত যোগসাধনা। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেন। এরপর তিনি আর ঘর থেকে বের হতেন না। তখন আশ্রমের পুরো দায়িত্ব পড়ে শ্রীমার ওপর। তিনি পৈতৃক সম্পদ ও টাকা খরচ করে আশ্রমের খরচ চালাতে লাগলেন। খাদ্য, কৃষি, শিল্প, গো-পালন প্রভৃতি বিভাগ খুলে তিনি আশ্রমটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে ফেললেন। দিন দিন আশ্রমে লোকজন বাড়তে লাগল। তিনি কর্মফলের আশা ত্যাগ করে অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে লাগলেন। তিনি একটি হাসপাতালও স্থাপন করলেন আশ্রমবাসীর চিকিৎসার জন্য।

শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীমা আশ্রমে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে এটি বিদ্যালয় ও পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তার নাম হয় 'ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অফ এডুকেশন'।

এখানে আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাও দেয়া হতো। বিশ্বের সব দেশের শিক্ষার্থীরা এখানে পড়তে আসত। এখানে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। যে কেউ যে-কোনো কাজ করত। ছোট-বড় কোনো কাজের কোনো পার্থক্য ছিল না। আশ্রমবাসীরা যেন প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব জানতে পারেন, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এই আদর্শে তিনি সব সময় কাজ করেছেন। আশ্রমের সব শিক্ষার্থীকে তিনি সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। সকলের সুখ-দুঃখের খবর রাখতেন। কাজই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সারা জীবন তিনি সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ করে মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করে গেছেন।

শ্রীমার একটি অভাবনীয় পরিকল্পনা ছিল শ্রীঅরবিন্দের নামে অরোভিল নগর প্রতিষ্ঠা। যে নগরীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক বাস করতে পারবে। পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মানুষ এসে থাকতে পারবে। তারা সেখানে আধ্যাত্মিক ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করবে। খাদ্য, চিকিৎসা কোনো কিছুর চিন্তা কাউকে করতে হবে না। সকল দেশের আচার-ব্যবহার ও খাদ্যরীতি বজায় রাখা হবে। সবাই একটি পরিবারের মতো বাস করবে। এই পরিকল্পনা তিনি করেন ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে। পন্ডিচেরীর উত্তর-পূর্বদিকে প্রায় ছয় মাইল দূরে সমুদ্র উপকূলে ১৫ বর্গমাইল ভূমি সংগ্রহ করেন। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি ১২৬টি দেশের মাটি দিয়ে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি শ্রীমার জন্মদিনে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। মায়ের আদর্শকে শিরোধার্য করে সেখানকার অধিবাসীরা সম্প্রীতির সাথে বাস করছেন।

শ্রীমা গান জানতেন, ভালো ছবি আঁকতেন। প্রতি বছরের শেষ দিন রাত বারোটার পর অর্গান বাজিয়ে তিনি নতুন বছরকে স্বাগত জানাতেন। বিভিন্ন রচনায় তাঁর সাহিত্যকৃতি ও কবিত্বশক্তির পরিচয় ফুটে ওঠে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে অরবিন্দ আশ্রম একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেতো বটেই, বাংলাদেশেও অরবিন্দ আশ্রম রয়েছে। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর পন্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।

সারসংক্ষেপ :

শ্রীমা ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনার চেয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল। তিনি প্যারিস শহরের বাইরে বনে গিয়ে ধ্যান করতেন। উনিশ বছর বয়সে আলজিরিয়ার প্লেমসেন শহরে তেঁও নামে একজনের কাছে হঠযোগ ও গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৯২০ সালের ২৪ এপ্রিল স্বামী মঁসিয়ে পল রিশারকে সাথে নিয়ে ভারতে আসেন। এখানে এসে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্যারিস ফিরে যান। আবার ১৯২৬ সালের ২৪ নভেম্বর অরবিন্দের আহ্বানে ফিরে আসেন। এর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করলে আশ্রম পরিচালনার সমস্ড় দায়িত্ব শ্রীমার ওপর পড়ে। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আশ্রমে খাদ্য, কৃষি, শিল্প, গোপালন ইত্যাদি কাজ শুরু করেন। তিনি আশ্রমবাসীদের জন্য হাসপাতাল ও পাঠশালা নির্মাণ করেন। এই সবকিছু তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি দিয়ে করেন। পন্ডিচেরী থেকে ছয় মাইল দূরে সমুদ্রতীরে শ্রীঅরবিন্দের নামে অরোভিল নগরী স্থাপন করেন। তিনি সারা জীবন আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ১৯৭৩ সালের ১৭ নভেম্বর এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান হয়।

পাঠ-১০.১২ মীরাবাঈ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মীরাবাঈয়ের জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন
- মীরাবাঈয়ের সাধনা ও কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	রাজপূত, রাজকন্যা, রাজস্থান, কুড়কি, জায়গির, প্রসব, মেড়তা, প্রাসাদ, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণপ্রেম, হরিকথা, কৃষ্ণমন্দির, অস্বাভাবিক, সহ্য, পদ, অনুবাদ, অস্বীকৃতি, সখী, তীর্থযাত্রা, গুজরাত ইত্যাদি।

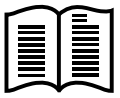

মীরাবাঈ :

মীরাবাঈ ছিলেন রাজপূত রাজকন্যা। ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজস্থানের কুড়কি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রত্নসিংহ। তিনি মেড়তার অধিপতি রাও দুধাজীর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। মীরাবাঈয়ের মাতার নাম বীর কুঁয়রী। তিনি ঝালবংশীয় রাজপুত্র শূরতান সিংহের কন্যা ছিলেন। রত্নসিংহ কুড়কি অঞ্চলে বারোখানা গ্রামের জায়গির পান এবং সেখানেই গড় নির্মাণ করে বাস করতেন।

মীরার আট বছর বয়সের সময় তাঁর মা দ্বিতীয় বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে মারা যান। মীরার বাবা তাঁকে নিয়ে খুব বিপদে পড়ে যান। তখন তাঁর দাদু রাও দুধাজী তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে যান। তিনি অতি যত্নে মীরার লালন-পালন করতে থাকেন।

মীরার দাদু রাও দুধাজী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ। মেড়তার প্রাসাদের পাশে ছিল তাঁরই প্রতিষ্ঠিত চতুর্ভুজজীর মন্দির। তিনি সেখানে পূজার্চনা করতেন। মীরাও দাদুর সাথে সেখানে যেতেন। মন্দিরের পুরোহিত গদাধর পন্ডিতের শাস্ত্রালোচনা শুনতেন। দাদুর কাছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের গল্প শুনতেন। ধীরে ধীরে মীরাও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। তিনি হয়ে উঠেন শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত।

কালক্রমে মীরা যৌবনে পা দিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত রূপবতী। ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র ভোজরাজের সঙ্গে মহাসমারোহে মীরার বিয়ে হয়। শ্বশুরবাড়িতে তাঁর কোনো কিছুর অভাব ছিল না। কিন্তু পার্থিব কোনো কিছুর প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী মনে করতেন। তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু ছিল কৃষ্ণপ্রেম ও তাঁর সাক্ষাৎ লাভ। প্রাসাদে কোনো সাধু-সন্ন্যাসী এলেই তিনি ছুটে যেতেন তাঁদের কাছে। একমনে হরিকথা শুনতেন। তাঁর স্বামী তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পারতেন। তিনি মীরাকে একটি কৃষ্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন। সেখানে বসে তিনি সাধনা করতেন।

১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে মীরাবাঈয়ের স্বামী ভোজরাজ এক যুদ্ধে মারা যান। তাঁর শ্বশুর রাণা সংগ্রামসিংহ তাঁকে দেশাশুনা করতেন। তাঁর শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাঁর দেবর বিক্রমাদিত্য চিতোরের অধিপতি হন। মীরাবাঈ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমে ও ভক্তিতে অনেক সময় অস্বাভাবিক আচরণ করতেন। তিনি নিজেকে বিধবা মনে করতেন না। যখন তখন তাঁর ভাবাবেশ হতো। তিনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেতেন। তাঁর দেবর এসব সহ্য করতে পারতেন না। মীরার দেবর ও তাঁর স্ত্রী তাঁকে বিভিন্নভাবে হত্যা করার চেষ্টা করে। কথিত আছে একবার তারা মীরাকে দীর্ঘদিন একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখেন এবং তাঁকে কোনো খাবারও দিতেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন তাঁকে একথালা করে খাবার দিতেন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একটি করে ভজন শোনাতেন।

তিনি প্রায় ১৩০০ পদ রচনা করেন। পরবর্তীকালে এই পদগুলো মীরার ভজন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পুরো ভারতবর্ষে মীরার ভজন খুব জনপ্রিয়। এই ভজন অন্য ভাষাতেও অনুবাদ করা হয়েছে এবং বিশ্বের অনেক দেশেই এই ভজন খুব জনপ্রিয়। এই সব ভজনের মাধ্যমে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য তার শর্তহীন ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

এরপর তিনি চিতোর থেকে মেড়তায় চলে আসেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর মন টেকে না। তিনি চলে যান বৃন্দাবনে। নিজেকে তিনি গোপী মনে করতেন। বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য রূপ গেস্বোমীর সাথে দেখা করতে চান। কিন্তু রূপ গোস্বামী কোনো মহিলার সাথে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন মীরা বলেন পৃথিবীর একমাত্র মহাপুর"ষ শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি তাঁর সখী, তিনি তাঁর তীর্থযাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং দক্ষিণ ভারতের এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে নৃত্যের তালে তালে ভজন গাইতে থাকেন।

তীর্থযাত্রা করতে করতে তিনি গুজরাতের দ্বারকায় পৌঁছান। ১৫৪৭ সালে মেবারের অধিপতি উদয় সিং তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য একদল ব্রাহ্মণকে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। মীরাবাঈ ঐ রাত শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে কাটানোর অনুমতি পান। কিন্তু পরদিন সকালে তাঁকে আর মন্দিরে পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় যে মন্দিরের কৃষ্ণমূর্তিতে তিনি লীন হয়ে গিয়েছিলেন। মীরাবাঈ তাঁর সারা জীবন কৃষ্ণের ভজনা করে গেছেন। তিনি কৃষ্ণসাধনার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ জগতে রেখে গেছেন।

সারসংক্ষেপ :

মীরাবাঈ ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজস্থানের কুড়কি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রত্নসিংহ ও মাতার নাম বীর কুঁয়রী। আট বছর বয়সে তাঁর মায়ের মৃত্যু হলে তাঁর দাদু রাও দুধাজী তাঁকে অতি যত্নে লালন-পালন করেন। দাদুর সাথে চতুর্ভুজজী মন্দিরে গিয়ে তিনি পূজা-অর্চনা করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত। ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু সংসারসহ পার্থিব কোনো কিছুর প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী মনে করতেন এবং সারাক্ষণ তাঁর সাধনায় নিয়োজিত থাকতেন। ১৫২৮ সালে এক যুদ্ধে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। তাঁর শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাঁর দেবর বিক্রমাদিত্য চিতোরের রাজা হন। মীরাবাঈ ভাবাবেশে অস্বাভাবিক আচরণ করত। তাঁর দেবর ও তাঁর স্ত্রী এসব সহ্য করতে না পেরে তাঁকে নানাভাবে হত্যা করতে চায়, কিন্তু ব্যর্থ হয়। পরে তিনি মেড়তায় চলে আসেন। সেখানেও মন টেকে না। এরপর চলে যান বৃন্দাবনে। এভাবে তাঁর তীর্থযাত্রা চলতে থাকে। তিনি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে নৃত্যের তালে তালে ভজন গান। তিনি প্রায় ১৩০০ ভজন রচনা করেন। এসব মীরার ভজন নামে পরিচিত। ১৫৪৭ সালে অলৌকিকভাবে তাঁর দেহাবসান হয়।

পাঠ-১০.১৩ প্রভু জগদ্বন্ধু

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- তাঁর সাধনপথ ও উপদেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	মুর্শিদাবাদ, ডাহাপাড়া, শাস্ত্রজ্ঞ, উপাসক, নেপালী, সাধক, ঠিকুজী, শহরতলী, ধ্রুবচরিত, পদ্মপলাশলোচন, বিভূতি, বিশ্বাস, সংকীর্তন, মহিমা, ব্যাকুল, বিভোর, বাগদী, লাঞ্ছনা, আলিঙ্গন, দিব্যদেহ, খ্রিষ্টান, পদকীর্তনীয়া, মহানাম, শ্রীঅঙ্গন, গম্ভীরা ইত্যাদি।

প্রভু জগদ্বন্ধু :

প্রভু জগদ্বন্ধু ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মে মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী (ন্যায়রত্ন)। তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তাঁর মাতার নাম বামাদেবী। তাঁরা রাধা-গোবিন্দের উপাসক ছিলেন। জগৎ ছিলেন তাঁদের তৃতীয় সন্তান জগতের জন্মের পর এক নেপালী সাধক তাঁর ঠিকুজি দেখেছিলেন,"এ যে রাজা হবে।" একথা শুনে জগতের পিতা বললেন, "সাধুজী, ক্ষমা করবেন, আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার ছেলে কি করে রাজা হবে?" সাধু মৃদু হেসে বললেন, "ভোগের রাজা নয়, যোগের রাজা"। এর কিছুদিন পর জগতের মা মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দীননাথ চক্রবর্তী জগতকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে নিজ গ্রাম ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর ফিরে এলেন। জেঠতুতো বোন দিগম্বরী জগতের লালন পালনের দায়িত্ব নেন। পাঁচ বছর বয়সের সময় জগতের হাতেখড়ি হয়। এর কিছু দিন পর তাঁর পিতা মারা যান। এর কয়েক মাস পরে জগতের বাড়ি পদ্মায় ভেঙে যায়। তখন তাঁরা ফরিদপুরের শহরতলী ব্রাহ্মণকান্দায় চক্রবর্তী পরিবারে এসে বাস করতে থাকেন। জগৎ ফরিদপুর জেলা স্কুলে পড়াশুনা করেন। এরপর পাবনা শহরে এসে পড়াশুনা করতে থাকেন।

ছবি : প্রভু জগবন্ধু

জগতের পড়াশুনা খুব বেশি দূর এগোয়নি। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকভাব জাগ্রত হতে থাকে। পাবনার শহরতলীতে 'ধ্রুবচরিত' যাত্রার অভিনয় দেখতে যান জগৎ। ধ্রুব আসরে এসে গান ধরল, "কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি"। এই গান শুনেই জগৎ ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন কৃষ্ণদর্শনের আশায়। জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি। ডাক্তার অনেক চেষ্টা করেও রোগের কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না। যতদিন যেতে লাগল তাঁকে আশ্রয় করে নানা যোগ বিভূতি প্রকাশ হতে লাগল। পাবনা শহরতলীতে এক বটবৃক্ষের নীচে এক সাধক ধ্যান করতেন। সবাই তাঁকে ক্ষ্যাপাবাবা ডাকতেন। এঁর সাথে জগতের খুব ভাব হলো। সাধু জগৎকে দেখে বলতেন, " এ হলো রাজা, আমরা সবাই তাঁর প্রজা।'

ধীরে ধীরে পাবনা শহরতলীতে জগতের এক ভক্ত গোষ্ঠী গড়ে উঠল। তাঁরা জগৎকে প্রভু জগদ্বন্ধু বলে ডাকতেন। তাঁরা সারাদিন হরিনাম ভজন-কীর্তন করে দিন কাটাতে লাগলেন। এরপর ভক্তদের ছেড়ে জগৎ বের হলেন তীর্থদর্শনে। ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছালেন বৃন্দাবনে। সেখানেও তাঁর ভক্তগোষ্ঠী গড়ে উঠল। একদিন তিনি ভক্তদের বললেন, আগামীকাল মধ্যাহ্নে এক মহাপুরুষ দেহরক্ষা করবেন। তোমরা তাকে ঘিরে ভজন-কীর্তন কর। ভক্তরা মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বিশাল তেঁতুল গাছকে দেখিয়ে দিলেন। ভক্তরা অবাক হলো। কিন্তু জগদ্বন্ধুর কথায় তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাই তারা

পরদিন সকাল থেকেই ঐ গাছটিকে ঘিরে নাম-সংকীর্তন করতে লাগলেন। মধ্যাহ্নে কোনো ঝড়-বৃষ্টি নেই, অথচ গাছটি মরমর শব্দে ভেঙে পড়ল। জগদ্বন্ধুর প্রতি ভক্তদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো। যতদিন যেতে লাগল তাঁর মহিমার প্রচার বাড়তে লাগল।

বৃন্দাবনে তিনি গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন। তাঁর প্রাণ রাধারাণীর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। কখনও তিনি রাধারাণীর নাম করতে করতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ছেন, আবার কখনও অবিরাম ঝরছে তাঁর অশ্রুধারা। ভক্তের আকুতিতে রাধারাণী তুষ্ট হয়ে তাঁকে দেখা দিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধু জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি লিখলেন–

"জয় রাধে ধর্ম, জয় রাধে জয়

জয় রাধে কর্ম, জয় রাধে জয়।"

এরপর থেকে রাধা নাম শুনলেই তিনি ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন।

১৮৯০ সালে তিনি ফরিদপুরের ব্রাহ্মণকান্দায় ফিরে এলেন। সেখানে এসে তিনি দেখলেন বুনো বাগদী সম্প্রদায় খুব কষ্টে আছে। সমাজের উঁচুস্তরের মানুষদের অবহেলা-লাঞ্ছনা সইতে না পেরে তারা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে চাইছে। প্রভু জগদ্বন্ধুর মন কেঁদে উঠল। তিনি বাগদীদের সর্দার রজনী মোড়লকে ডেকে পাঠালেন। রজনী আসলে প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভুর দিব্যদেহের স্পর্শে রজনী ধন্য হলো। প্রভু রজনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রজনী, তোমরা নাকি খ্রিষ্টান হতে চাও? কেন বলে তো?" রজনী বলল, 'প্রভু, আমরা বুনো জাতি, সবাই আমাদের নীচ মনে করে পায়ে ঠেলে রাখে। খ্রিষ্টান হলে আমাদের এ অবস্থা থাকবে না"। তখন জগদ্বন্ধু বললেন, "কে বলে তোমরা নীচ? তোমরা মানুষ। মানুষের মধ্যে আবার উচ্চ-নীচ কী? আর এ জাতি, সে জাতি বা কি? শ্রীহরির দাস তোমরা, তোমাদের পাড়ার সকলে মোহান্ত বংশ। আর তোমার নাম হরিদাস মোহান্ত। ভুবন মঙ্গল হরিনাম কর, সকলে ধন্য হও। অচিরেই তোমাদের সকল দুঃখ ঘুচবে"। প্রভুর কৃপা পেয়ে সব দুঃখ ভুলে হরির নামসংকীর্তনে মেতে উঠল। এরপর তাদের বলা হতো পদকীর্তনীয়া। হরিনাম কীর্তন ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। গড়ে উঠল মহানাম সম্প্রদায়। আর এই কাজে প্রভুর প্রিয় শিষ্য শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী সব ধরনের সাহায্য করলেন।

কোলকাতার ডোমদেরও প্রভু একইভাবে প্রেরণা যুগিয়ে নামসংকীর্তনে আগ্রহী করে তোলেন। তারা হয়ে উঠে ব্রজজন।

এরপর প্রভু একদিন ভক্তদের নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন। ফরিদপুর শহরের অনতিদূরে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে এসে তিনি বললেন, "এখানেই আমি শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা করব"। সেখানেই শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হলো। এই শ্রীঅঙ্গনে শুরু হয় প্রভুর গম্ভীরা লীলা। ১৩০৯ সালের (১৯০২ খ্রি:), আষাঢ় মাস থেকে ১৩২৫ সালের (১৯১৮ খ্রি.) ১৬ ফাল্গুন পর্যন্ত ১৬ বছর ৮ মাস প্রভু গম্ভীরালীলা করেন। এই সময় জানালাবিহীন ছোট একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে তিনি ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। কারও সাথে কথা বলতেন না। ১৩২৮ সালের (১৯২১ খ্রি.) ১ আশ্বিন প্রভু অগণিত ভক্তদের চোখের জলে ভাসিয়ে ইহলীলা সংবরণ করেন।

প্রভু জগদ্বন্ধুর কয়েকটি উপদেশ–

১. ভ্রষ্টবুদ্ধি হয়ে পিতা-মাতার মনে কষ্ট দিতে নেই। যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না।

২. পরচর্চা কর্ণে বা অন্তরে স্থান দিও না। পরচর্চা বিষবৎ ত্যাগ কর। ঘরের দেয়ালে লিখে রাখ, পরচর্চা নিষেধ।

৩. মানুষগুরু মন্ত্র দেয় কানে, জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।

সারসংক্ষেপ :

প্রভু জগদ্বন্ধু ১৮৭১ সালের ১৭ মে মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী ও মাতার নাম বামাদেবী। জগতের জন্মের পর এক নেপালী সাধু তাঁকে দেখে বলেন যে এই ছেলে যোগের রাজা হবে। তাঁর জন্মের কিছুকাল পর তাঁর মায়ের মৃত্যু হলে বাবা তাঁকে নিয়ে ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুরে পৈতৃক বাড়িতে চলে আসেন। জগতের জেঠতুতো পিসি সেখানে তাঁকে লালন-পালন করেন। পাঁচ বছর বয়সে জগতের পিতা মারা যান এবং তাঁদের বাড়িও পদ্মায় ভেঙে যায়। তখন তাঁরা ফরিদপুর শহরতলীর ব্রাহ্মণকান্দায় চক্রবর্তী বাড়ি চলে আসেন। প্রথমে ফরিদপুর জেলা স্কুল ও পরে পাবনায় জগৎ পড়াশুনা করেন। কিন্তু পড়াশুনায় তাঁর মন ছিল না। পাবনার শহরতলীলে ধ্রুবচরিত নাটক দেখে জগতের ভাবাবেশ হয় এবং এরপর থেকে তাঁর ভিতর আধ্যাত্মিকভাব প্রবল হতে থাকে। তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে সাধনা করেন ও তাঁর এক বিশাল ভক্তগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ১৮৯০ সালে তিনি আবার ব্রাহ্মণকান্দায় ফিরে আসেন। তিনি সেখানকার বুনো বাগদী ও কোলকাতার ডোমদের ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে বিরত করে তাদেরকে হরিনামে দীক্ষিত করেন। তিনি ফরিদপুরের অদূরে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ১৬ বছর ৮ মাস গম্ভীরা লীলা করেন। ১৩২৮ সনের ১ আশ্বিন তাঁর জীবনাবসান হয়।

পাঠ-১০.১৪ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিজয়কৃষ্ণের জীবনী সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- তাঁর সাধনপথ ও উপদেশাবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ/ (Key Words)	তিথি, ঝুলনযাত্রা, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ধর্মনিষ্ঠ, দয়াবতী, পাঠশালা, শান্ত, অনুরাগী, বেদান্ত, ভক্তিবাদী, মায়াবাদী, ভাষ্য, হিতসঞ্চারিণী, পৈতা, জাতিভেদ, ব্রাহ্মধর্ম, মণিকর্ণিকা, বারদী, ছলনা, লাড্ডু, শ্রীক্ষেত্র ইত্যাদি।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী :

বাংলা ১২৪৮ সালের (১৮৪১ খ্রি:) শ্রাবণ মাসে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুভ তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে নবদ্বীপের শান্তিপুরের প্রতিটি বৈষ্ণব মন্দিরে উৎসব হচ্ছিল। সেই দিন ভোরবেলা শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আনন্দকিশোর গোস্বামী। তিনি ছিলেন পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত। মা স্বর্ণময়ী দেবীও ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ দয়াবতী রমণী

গ্রামের পাঠশালাতেই বিজয়কৃষ্ণের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এরপর শান্তিপুরের টোলে সংস্কৃত পড়েন। তারপর কোলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির এবং ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগী। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় শিকারপুরের রামচন্দ্র ভাদুড়ীর বড় মেয়ে যোগমায়ার সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের বিয়ে হয়।

বেদান্ড় পড়তে পড়তে বিজয়কৃষ্ণের ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন আসে। ভক্তিবাদী মতবাদ ছেড়ে তিনি হয়ে ওঠেন মায়াবাদী। তিনি বেদান্ড় দর্শনের একটি ভাষ্যও রচনা করেন।

সংস্কৃত কলেজে কিছুদিন পড়াশুনা করে বিজয়কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সেখানে কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে তিনি 'হিতসঞ্চারিণী' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সভায় সিদ্ধান্ড় হয় যিনি যা সত্য বলে মনে করবেন, তা মনেপ্রাণে কার্যে পরিণত করবেন। এক দিন বিজয়কৃষ্ণ সভায় বললেন যে, 'পৈতা জাতিভেদের চিহ্ন'। তাঁর এ কথা শুনে উপস্থিত ব্রাহ্মণ সকলে পৈতা খুলে ফেললেন।

ছবি : শ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী

এই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে তাঁর মনে পরিবর্তন আসে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর তিনি শান্তিপুরে ফিরে এলে স্থানীয় লোকজন, তাঁর আত্মীয়-স্বজন এমনকি তাঁর পরিবারও তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

তিনি কোলকাতায় ফিরে আসেন। সামনে তাঁর মেডিকেলের ফাইনাল পরীক্ষা। তিনি পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন সময় ব্রাহ্মসমাজ থেকে ডাক এল ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য। পরীক্ষা বাদ দিয়ে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে বের হলেন। ঢাকা, বরিশাল, যশোর, খুলনা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন, অনেককে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেন।

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারণা করতে করতে তিনি কাশীতে পৌঁছান। সেখানে মণিকর্ণিকা গঙ্গার ঘাটে ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি অন্তর্দিষ্টিতে বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে ভক্তিধর্মের উন্মেষভাব উপলব্ধি করেন। তিনি বিজয়কৃষ্ণের কানে নামমন্ত্র দিয়ে বললেন, "আমি তোর গুরু নই, সময়ে গুরু লাভ হবে। বসন্তের দাওয়াই যেমন বসন্ত, তেমন নামমন্ত্র দিলাম। অন্য কথা কানে লাগবে না'।

উত্তরাঞ্চলে অবস্থানকালে এক সময় বিজয়কৃষ্ণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী অলৌকিকভাবে তাঁর প্রাণ বাঁচান। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁর মধ্যে আবার বৈষ্ণবভাব জাগ্রত হয়। গয়ার আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে শক্তিধর যোগী পুরুষ ব্রহ্মানন্দ স্বামী তাঁকে পুনরায় দীক্ষা দিয়ে হিন্দুযোগীতে পরিণত করেন। আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে তিনি এগারোদিন সমাধিমগ্ন ছিলেন। এরপর গুরুর নির্দেশে কাশীতে যান। সেখানে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রীহরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করতে চাইলে গুরু ব্রহ্মানন্দ সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নেই, সংসারে অবস্থান করেই তোমার সাধন অব্যাহত থাকবে'।

ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে বিজয়কৃষ্ণ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও ভক্তদের দিয়ে অর্থ সংকটে পড়লেন। তখন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রেরণায় ঢাকার গেন্ডারিয়াতে আশ্রম স্থাপন করে নামসংকীর্তন করত লাগলেন। তাঁর অভাব দূর হলো। ঢাকায় তাঁর প্রভাব বাড়তে লাগল।

তিনি মাঝেমাঝেই কোলকাতা যেতেন। একবার স্ত্রীসহ বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে কলেরা রোগে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হলো। এরপর ১৩০৪ সালের (১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) ফাল্গুন মাসে তিনি শ্রীক্ষেত্রে চলে যান। শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার আগে তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন, তুমি যেখানে খুশি যাও কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে যেওনা। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু মায়ের ভয়ই কার্যে পরিণত হলো। তিনি আর ফিরে আসেননি। সেখানে তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে একদল ভন্ড ধর্মব্যবসায়ী ছলনা করে তাঁকে বিষমিশ্রিত লাড্ডু খাইয়ে দেন। লাড্ডু খেয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিৎসা চলতে লাগল। কিন্তু তিনি আর সুস্থ হলেন না। অবশেষে ১৩০৬ সালের (১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) ২২ জ্যৈষ্ঠ এই মানবপ্রেমিক ধর্মগুরন্ড বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইহলীলা সংবরণ করেন।

বিজয়কৃষ্ণের উপদেশঃ

১. হরিনামে প্রেমলাভের আটটি ক্রম–

(ক) পাপবোধ (খ) পাপকর্মে অনুতাপ

(গ) পাপে অপবৃত্তি (ঘ) কুসঙ্গে ঘৃণা

(ঙ) সাধুসঙ্গে অনুরাগ (চ) নামে রুচি ও গ্রাম্যকথায় অরুচি

(ছ) ভাবোদয় (জ) প্রেম

২. কখনও পরনিন্দা করবে না।

৩. সত্য কথা বলবে ও সর্বদা ব্রহ্মচর্য রক্ষা করবে।

সারসংক্ষেপ :

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১২৪৮ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা অনুষ্ঠানের পুণ্যতিথিতে নবদ্বীপের শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আনন্দকিশোর গোস্বামী ও মাতার নাম স্বর্ণময়ী দেবী। তাঁর স্ত্রীর নাম যোগমায়া। শান্তিপুরের টোলে পড়া শেষ করে তিনি কোলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সেখানে অধ্যয়নকালে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন হয় এবং তিনি ভক্তিবাদী দর্শন ছেড়ে মায়াবাদী দর্শন গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মেডিকেল কলেজে পড়াকালীন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। মেডিকেল কলেজের ফাইনাল পরীক্ষা বাদ দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে বের হন। উত্তরাঞ্চলে অবস্থানকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে বারদীর লোকনাথ বাবার কৃপায় সুস্থ হন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তিনি আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসেন। গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে দীক্ষা দেন। তিনি ঐ পাহাড়ে এগারো দিন ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি স্থান ঘুরে শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছান। তাঁর মা তাঁকে শুরু থেকেই বলেছিলেন তুমি যেখানেই যাও শ্রীক্ষেত্রে যাবে না। মায়ের ভয়ই ঠিক ছিল। কারণ সেখানে তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে একদল ভন্ড ধর্মব্যবসায়ী তাঁকে বিষমিশ্রিত লাড্ডু খাইয়ে হত্যা করে। ১৩০৬ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ তাঁর জীবনাবসান হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট : ১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. শ্রীবিষ্ণু তাঁর পা কার উপরে রাখলেন?

ক. বলি খ. হিরণ্যকশিপু

গ. কংস ঘ. বৃত্র

২. ঈশ্বরের লীলাবতার কতজন?

ক. ১৪ খ. ১২

গ. ১০ ঘ. ১৬

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

প্রেমা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান শেষে মন্দিরে বসে গীতা পাঠ করে। এই গ্রন্থটি পাঠ করে সে জীবনপথে চলার নানা উপদেশ পায়। যা সে তার জীবনে প্রয়োগ করে।

৩. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করে আমরা জীবনে চলার যেসব উপদেশ পাই তা হলো :

i. ধর্মপথে চলার উপদেশ পাই ii . অধার্মিকভাবে কাজ করার উপদেশ পাই

iii.সব হিংসা-দ্বেষ ভুলে সকলকে নিয়ে বাঁচতে অনুপ্রাণিত হই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. ব্যাসদেবের অন্যতম সেরা কৃতি কোনটি?

ক. রামায়ণ রচনা খ. মহাভারত রচনা

গ. কৃষ্ণচরিত রচনা ঘ. ভাগবত রচনা

৫. আঠারোটি পুরাণ ছাড়াও ব্যাসদেব কতটি উপপুরাণ লিখেছেন?

ক. একুশটি খ. বাইশটি

গ. উনিশটি ঘ. আঠারোটি

৬. শ্রীচৈতন্য কোন দেবতার ভক্ত ছিলেন?

(ক) শ্রীব্রহ্মা (খ) শ্রীবিষ্ণু

(গ) দুর্গা (ঘ) শ্রীকৃষ্ণ

৭. তুকারাম যে শহরে জন্মগ্রহণ করেন তার নাম কী?

ক. পুনে খ. দেহু

গ. কেকাতা ঘ. কল্যাণী

৮. নিচের কোন নামগুলো তুকারামের পুত্রদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?

i. মহাদেব, নারায়ণ

ii. বিভূতি, সহদেব

iii. নারায়ণ, বিথোবা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

৯. ভক্তিসম্প্রদায়ের একজন বড় সাধু ছিলেন–

ক. শ্রীচৈতন্য খ. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

গ. তুকারাম ঘ. প্রভু জগদ্বন্ধু

১০. তুকারামের রচিত সব গান কী নামে পরিচিত?

ক. সার্গাম-গীত খ. শ্লোক

গ. ভজন-কীর্তন ঘ. অভং

১১. রামপ্রসাদের পিতার নাম কী?

ক. সত্যেন সেন খ. রায় বাহাদুর সেন

গ. কমলাকান্ত সেন ঘ. রামরাম সেন

১২. ছোট বেলা থেকেই রামপ্রসাদের কিসের প্রতি আকর্ষণ ছিল?

ক. খেলাধুলার প্রতি খ. ভক্তিপথের প্রতি

গ. গান-বাজনার প্রতি ঘ. পড়াশুনার প্রতি

১৩. রামপ্রসাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে–

i. মা কালী, আগমবাগীশ

ii. দুর্গাচরণ, তন্ত্রসার

iii. অশোক, পিপল গাছ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i, ii ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

১৪. রামপ্রসাদ কার উপাসক ছিলেন?

ক. কালী খ. দুর্গা

গ. মনসা ঘ. শীতলা

১৫. রাণী রাসমনি তাঁর স্বামীকে বলে গঙ্গার যে ঘাটটি সংস্কার করেন তার নাম কী?

(ক) বাবুঘাট (খ) বাবুরোড

(গ) আহিরীটোলা (ঘ) নিমতলা

১৬. রাণী রাসমণির টোনার খাল খনন করার কারণ–

i. নবগঙ্গার সংযোগ সাধন

ii. প্রজাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

iii. জমিদারদের সুবিধা প্রদান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

১৭. দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের প্রথম পূজারী কে ছিলেন?

(ক) শ্রীরামকুমার (খ) শ্রীরামকৃষ্ণ

(গ) শ্রীরামচন্দ্র (ঘ) শ্রীশঙ্করাচার্য

১৮. হরিচাঁদ ঠাকুরের চিকিৎসা পদ্ধতি কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত?

(ক) তান্ত্রিকশাস্ত্র (খ) আধ্যাত্মিক শক্তি

(গ) চিকিৎসাশাস্ত্র (ঘ) বিষ্ণুর শক্তি

১৯. হরিচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে বলা হয়–

(ক) মতুয়া (খ) শৈব

(গ) বৈষ্ণব (ঘ) শাক্ত

২০. মতুয়াদের সাধনপথের মূলকথা–

i. মনুষ্যত্ব অর্জন

ii. আত্মোন্নতি

iii. সার্বিক কল্যাণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. শ্রীরামকৃষ্ণ কোন দেবীর উপাসক ছিলেন?

(ক) কালী (খ) দুর্গা

(গ) শীতলা (ঘ) লক্ষ্মী

২২. শ্রীরামকৃষ্ণ কার নিকটে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নেন?

(ক) ভৈরবী (খ) তোতাপুরী

(গ) নরেন্দ্রনাথ (ঘ) কেশব সেন

২৩. যে সাধন পথ অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা করেছেন–

i. শাক্ত সাধনপথ

ii . বৈষ্ণব সাধনপথ

iii . খ্রিষ্টান সাধনপথ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

২৪. শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনালব্ধ সত্য কী?

(ক) ভক্তিতেই মুক্তি (খ) যত মত তত পথ

(গ) ঈশ্বর সাকার (ঘ) ঈশ্বর নিরাকার

২৫. স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম কী?

(ক) বিশ্বনাথ (খ) মহেন্দ্র

(গ) নরেন্দ্রনাথ (ঘ) ভূপেন্দ্র

২৬. তিনি কোথায় ধর্ম মহাসম্মেলনে বক্তৃতা করেন?

(ক) আমেরিকা (খ) ফ্রান্স

(গ) ইতালি (ঘ) ইংল্যান্ড

২৭. স্বামী বিবেকানন্দের উপলব্ধ সত্য হচ্ছে–

i. সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি

ii. জীবপ্রেম

iii. ঈশ্বরসেবা

নিচের কোনটি সত্য?

(ক) i (খ) ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৮. শ্রীমা কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?

(ক) শিকাগো (খ) প্যারিস

(গ) লন্ডন (ঘ) জেনেভা

২৯. শ্রীমা অরবিন্দ আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করেন–

i. দুগ্ধখামার

ii. হাসপাতাল

iii. কৃষিকাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. অরবিন্দ আশ্রমে শিক্ষা দেয়া হতো–

i আধ্যাত্মিক জ্ঞান

ii অন্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া

iii অভেদ জ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৩১. মীরাবাঈ কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?

(ক) গুজরাত (খ) বিহার

(গ) রাজস্থান (ঘ) আসাম

৩২. তিনি কোন দেবতার সাধনা করতেন?

(ক) শ্রীকৃষ্ণ (খ) শ্রীরাম

(গ) শ্রীবিষ্ণু (গ) শ্রীব্রহ্মা

৩৩. প্রভু জগদ্বন্ধু কোন জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন?

(ক) হুগলী জেলায় (খ) মুর্শিদাবাদ জেলায়

(গ) হাওড়া জেলায় (ঘ) বর্তমান জেলায়

৩৪. প্রভু জগদ্বন্ধু নিচু জাতির মানুষদের হরিনামে উদ্ধুদ্ধ করেন কারণ তিনি মনে করতেন–

i. পৃথিবীর সব মানুষ সমান

ii. পৃথিবীর সব মানুষ শ্রীহরির দাস

iii. শ্রীহরির নামসংকীর্তনেই সবার মুক্তি

নীচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii

(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

৩৫. প্রভু জগদ্বন্ধু কোথায় ইহলীলা সংবরণ করেন?

(ক) বৃন্দাবনে (খ) ফরিদপুরে

(গ) যশোরে (ঘ) বরিশালে

৩৬. কোন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বিজয়কৃষ্ণ পৈতা খুলে ফেলেছিলেন?

(ক) ব্রাহ্মধর্ম (খ) খ্রিষ্টানধর্ম

(গ) বৌদ্ধধর্ম (ঘ) হিন্দুধর্ম

৩৭. হরিনামে প্রেমলাভের ক্রম হচ্ছে–

i. পাপবোধ

ii. পাপে অপবৃত্তি

iii. প্রেম

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i (খ) ii

(গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৮. তিনি কোথায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নামসংকীর্তন করেন?

(ক) ঢাকা (খ) বারদী

(গ) কাশী (ঘ) শ্রীক্ষেত্র

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুগপরিক্রমার এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি মঙ্গলময় কাজ করেছেন। তিনি ন্যায় পরায়ণতার শিক্ষা দিয়েছেন। দুষ্টের দমন করেছেন, সাধুদের রক্ষা করেছেন। তিনি ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছেন। তিনি সত্য, শক্তি, সুন্দর ও শান্তির প্রতীক।

(ক) শ্রীকৃষ্ণের বাবা-মায়ের নাম কী?

(খ) শ্রীকৃষ্ণ কীভাবে কংসকে হত্যা করেছিলেন বর্ণনা করুন।

(গ) গীতার বাণী কীভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে?

(ঘ) 'শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনই আমাদের কাছে শিক্ষণীয়'– ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

হিন্দুসমাজের এক চরম দুঃসময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। তখন বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষের মনে হিংসা-বিদ্বেষ বেড়ে গিয়েছিল। শ্রীচৈতন্য ভক্তির ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সমাজ থেকে উচ্চ-নীচ বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূর করেছিলেন। তিনি সবাইকে বুকে স্থান দিয়ে তখনকার হিন্দুসমাজকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করেছিলেন।

(ক) শ্রীচৈতন্যদেব কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

(খ) শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকালে সমাজজীবনের অবস্থা বর্ণনা করুন।

(গ) শ্রীচৈতেন্যর প্রচারিত প্রেমভক্তির ধর্ম আমাদের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে?

(ঘ) 'হিন্দুধর্মকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা শ্রীচৈতন্যের সবচেয়ে বড় অবদান'– আলোচ্য পাঠ্যের আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

বাংলার হিন্দুসম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে রামপ্রসাদী অত্যন্ত জনপ্রিয় গান। রামপ্রসাদ সেন ছিলেন মা কালীর একনিষ্ঠ ভক্ত। সর্বদাই তিনি মায়ের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।

ক. রামপ্রসাদের স্ত্রীর নাম কী?

খ. রামপ্রসাদের বাল্যকাল কেমন ছিল? ব্যাখ্যা করুন।

গ. 'রামপ্রসাদ ছিলেন মা কালীর প্রকনিষ্ঠ ভক্ত'– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

ঘ. রামপ্রসাদের জীবন থেকে আমরা কী আদর্শে বড় হতে পারি? মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪

রাণী রাসমণি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মানুরাগিণী ও দানশীলা। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রভূত কাজ করেছেন। তিনি জেলেদের স্বার্থে গঙ্গার জলকর বন্ধ করেন, নীলকরের উৎপীড়ন বন্ধ করেন। তিনি গঙ্গার ঘাট ও বিভিন্ন রাস্তাঘাট সংস্কার করেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যেমন ছিলেন ধার্মিক তেমন ছিলেন মানবদরদী। তিনি সমস্ত জীবন ঈশ্বরের পূজা এবং জনসাধারণের কল্যাণ করে গেছেন।

(ক) রাণী রাসমণি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

(খ) গঙ্গার জলকর বন্ধের জন্য তিনি কী করেছিলেন?

(গ) নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে রাণী রাসমণির শিক্ষা কীভাবে প্রয়োগ করা যায়?

(ঘ) 'রাণী রাসমণি যেমন ছিলেন ধার্মিক তেমনি ছিলেন মানবদরদী'– তোমার পাঠ্যের আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজ শাসনের বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা এদেশের সমাজব্যবস্থা তথা ধর্মীয় জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে যুবসমাজ এই পরিবর্তনের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেয়। এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। তিনি বিভিন্ন সাধনপথ অনুসরণ করে সাধনা করেন। তিনি বলেন যে, যে-কোনো ধর্মের সাধনপথ অনুসরণ করেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়। তাঁর উপলব্ধ সত্য হচ্ছে ' যত মত তত পথ।' তাঁর এই মত ও পথের আদর্শ এদেশের যুবসমাজ তথা আপামর জনসাধারণকে আশার আলো দেখায়।

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা-মাতার নাম কী?

(খ) শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপথের বর্ণনা দিন।

(গ) শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকে আপনি নিজের জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন?

(ঘ) 'যত মত তত পথ'– শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপলব্ধ সত্যটি মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৬

ভারতবর্ষের এক যুগসন্ধিক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমাজ থেকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা দূর করার ব্রত নেন। তিনি হিন্দুসমাজকে সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করেন। সমগ্র বিশ্বের কাছে হিন্দুধর্মের অজানা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সবাইকে শিক্ষা দেন যে, 'জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা।' তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আমরাও মানবজীবনকে ধন্য করতে পারি।

(ক) স্বামী বিবেকানন্দের পিতা-মাতার নাম কী?

(খ) স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন ব্যাখ্যা করুন।

(গ) 'জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা'– এই সত্যকে আপনি নিজের জীবনে কীভাবে কাজে লাগাতে পারবেন।

(ঘ) 'আদর্শ জীবন গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা অনুসরণীয়'– উক্তিটি মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। হঠাৎ তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের জন্য তিনি পরিবার, আত্মীয়স্বজনসহ সকলের নিকট লাঞ্ছনার স্বীকার হন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে বের হন। এর এক পর্যায়ে শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে আবার তাঁর মনের পরিবর্তন হয়। তিনি পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হন। ঢাকায় আশ্রম স্থাপন করে তিনি হরিনাম সংকীর্তনে মেতে ওঠেন।

(ক) শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত সভার নাম কী?

(খ) তিনি পুনরায় কীভাবে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হন?

(গ) শ্রীবজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিক্ষা আপনার জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে?

(ঘ) 'আদর্শ জীবন গঠনে বিজয়কৃষ্ণের হরিনামে প্রেমলাভের আটটি ক্রম অনুসরণীয়"– উক্তিটি মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা : ইউনিট-১০

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১.ক ২.গ ৩.ক ৪.খ ৫.গ ৬.ঘ ৭.ক ৮.ঘ ৯.গ ১০.ঘ ১১.ঘ ১২.খ ১৩.খ ১৪.ক ১৫.ক ১৬.গ ১৭.ক ১৮.খ ১৯.ক ২০.ঘ ২১.ক ২২.খ ২৩.ঘ ২৪.ক ২৫.গ ২৬.ক ২৭.ঘ ২৮.খ ২৯.ঘ ৩০.ঘ ৩১.ক ৩২.ক ৩৩.খ ৩৪.ঘ ৩৫.খ ৩৬.ক ৩৭.ঘ ৩৮.ক।